দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

পোড়া মানুষের গন্ধে
মাতাল শান্তির 'মরূদ্যান'
পশ্চিমবঙ্গ— পৃঃ ১১

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন
বাঙ্গালির শিকড়ে রয়েছেন
শ্রীরামচন্দ্র — পৃঃ ৩১

৭৪ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা।। ৪ এপ্রিল, ২০২২।। ২০ চৈত্র - ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

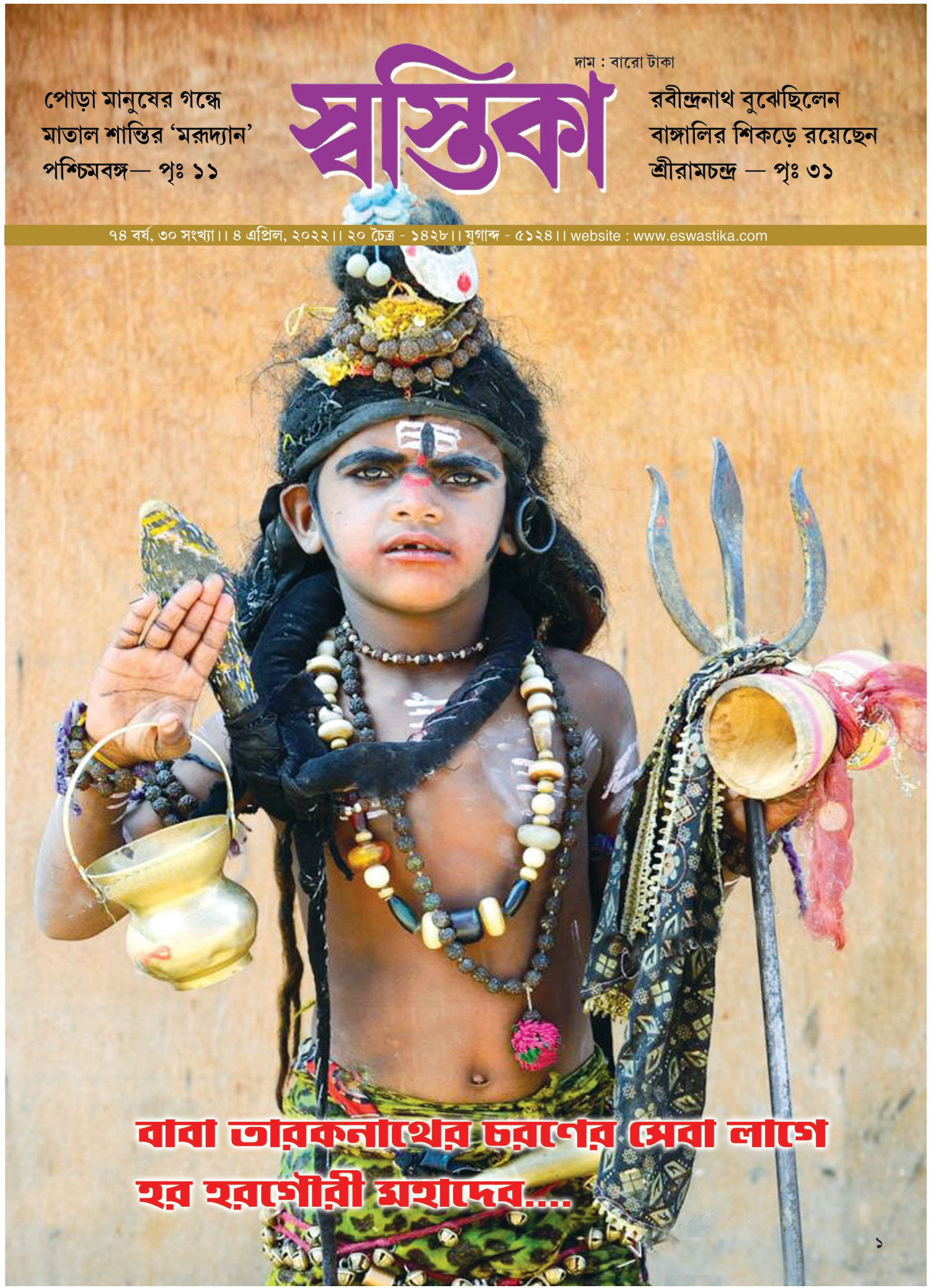

বাবা তারকনাথের চরণের সেবা লাগে
হর হরগৌরী মহাদেব....

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৩০ সংখ্যা, ২০ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

৪ এপ্রিল - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

আবার বলতেই হচ্ছে 'এরা জননীর গর্ভের লজ্জা', ঔরসের অপজাত সন্তান □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

সিবিআই তদন্তের চৈত্র সেল একটার সঙ্গে একটা ফ্রি □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

উদ্যমী পুরুষকারের সঙ্গে পরিবারবাদের অসম সংগ্রাম □ রুচির শর্মা □ ৮

প্রশ্নের মুখে সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্প □ বিশ্বামিত্র □ ১০

পোড়া মানুষের গন্ধে মাতাল শান্তির 'মরুদ্যান' পশ্চিমবঙ্গ □ সুজিত রায় □ ১১

এত রক্ত বাঙ্গালি আর দেখতে চায় না □ পরিচয় গুপ্ত □ ১৩

প্রকৃতির সঙ্গে থাকতে হলে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলতে হয় □ তপন কুমার বৈদ্য □ ১৭

অনাদায়ী ঋণের বোঝা কমাতে 'ব্যাড ব্যাংক' গঠনের সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী □ আনন্দ মোহন দাস □ ১৮

বাবা তারকেশ্বরের চরণের সেবায় □ অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় □ ২৩

সাক্ষাৎকার : চড়কের মতো পার্বণ আছে বলে একটুকরো গ্রামবাঙ্গলা এখনো বেঁচে আছে □ ভবানী শঙ্কর বাগচী □ ২৪

পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গ্রাম পরিক্রমা করে নীল পাগলের দল □ সুকল্যাণ জানা □ ২৬

সাক্ষাৎকার : দু'শো বছরের পুরনো বাঁকুড়ার মণ্ডলকুলির গাজনের মেলা □ অনামিকা দে □ ২৭

সাক্ষাৎকার : ছাতুবাবুর বাজারে কলকাতার সব থেকে পুরনো চড়কের মেলা □ নিজস্ব প্রতিনিধি □ ২৮

বগটুই হত্যাকাণ্ডে তৃণমূল যোগ প্রমাণিত মাননীয়ার আচরণে □ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ২৯

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন বাঙ্গালির শিকড়ে রয়েছেন রামচন্দ্র □ কল্যাণ গৌতম □ ৩১

চৈত্র সংক্রান্তি আর গাজনের দিনগুলো □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৩৪

শিবের সঙ্গে কালীর বিবাহে গাজন সন্ন্যাসীরা বরপক্ষ □ হীরক কর □ ৩৫

নরেন্দ্র মোদী ভারতের মানুষের হৃদয় জয় করেছেন □ রামানুজ গোস্বামী □ ৪৩

বাংলাদেশে ক্ষেপণাস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণাগার বানাচ্ছে চীন, উদ্বিগ্ন ভারত □ নিজস্ব প্রতিনিধি □ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ৩০ □ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ১১ এপ্রিল ২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১১ এপ্রিল ২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বাঙ্গলার নবজাগরণ

আগামী সপ্তাহের স্বস্তিকা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে। নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ায় বাঙ্গালির চিরাচরিত আবেগ এবং বাঙ্গলার নবজাগরণ নিয়ে বিশেষ আলোচনা থাকবে সংখ্যাটিতে।

লিখবেন— অভিজিৎ দাশগুপ্ত, ড. রাজলক্ষ্মী বসু, স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ, অভিমন্যু গুহ প্রমুখ।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ আবেদন

প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পাঠানো সত্ত্বেও ডাকযোগে বহু গ্রাহকই স্বস্তিকা ঠিকমতো পাচ্ছেন না— এরকম অভিযোগ আমরা হামেশাই পাচ্ছি। এবিষয়ে ডাকবিভাগে যোগাযোগ করেও কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই, আমরা রেজিস্ট্রি পোস্টের মাধ্যমে স্বস্তিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। যাঁরা রেজিস্ট্রি খরচ বহন করতে আগ্রহী তাঁরা রেজিস্ট্রি খরচ কার্যালয়ে জমা দিলে আমরা তাঁদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকের মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।

রেজিস্ট্রি খরচ—

প্রতি সপ্তাহে ২২.০০ টাকা।

এক মাসের পত্রিকা একসঙ্গে পাঠালে ৩০.০০ টাকা।

(বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ছাড়াও এই রেজিস্ট্রি খরচ অতিরিক্ত দিতে হবে।)

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শিবঠাকুর নৈরাজ্যের অবসান করুন

বাঙ্গালির বারো মাসে তেরো উৎসব। আর উৎসব হইল এক আনন্দঘন অনুষ্ঠান। উৎসবের মধ্য দিয়াই বাঙ্গালি তাহার হৃদয়কে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলিয়াছেন, 'মানুষ প্রতিদিন ক্ষুদ্র, দীন, একাকী। কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ ; সেইদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ; সেইদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।' উৎসবের মধ্যেই রহিয়াছে বাঙ্গালির প্রাণের পরিচয়। বাঙ্গালির উৎসব শুরু হয় বৈশাখের প্রথম দিন হইতে আর শেষ হয় চৈত্র সংক্রান্তির দিনে। চৈত্র সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করিয়া উৎসবটিকে বাঙ্গালি নানা নামে ভূষিত করিয়াছে। যেমন চড়কপূজা, নীলপূজা, গাজন, গম্ভীরা ইত্যাদি। এই উৎসবের মাধ্যমে বাঙ্গালি তাহার ঘরের ঠাকুর শিবঠাকুরের সহিত একাত্ম হইয়া পড়ে। শিবঠাকুরকে খুশি করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য তাহারা কত কিছুই না করিয়া থাকে। কঠিন কঠোর আত্মনিগ্রহকে তাহারা ভক্তিভরে স্বীকার করিয়া লয়। একটিই কামনা — ভূত-প্রেত, দস্যিদানো, মৃত্যুভয়, রোগজ্বালা সবকিছু হইতে শিবঠাকুর তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন। দেবাদিদেব মহাদেবকে ভালোবাসিয়া তাঁহাকে বুড়ো শিব নাম দিয়াছে। বাঙ্গালির সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই হইল কল্যাণী ইচ্ছা— দেশ ও দশের মঙ্গল সাধন। করোনাকালে তাহারা ধুমধাম করিয়া উৎসবের আয়োজন করিতে না পারিলেও শিবঠাকুরের কাছে তাহাদের আর্তি ছিল করোনাসুর হইতে মুক্তি লাভ। চৈত্র সংক্রান্তির উৎসবটি যদিও খেটে খাওয়া গরিব মানুষের উৎসব, তথাপি সমগ্র সমাজ সেইদিন তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া একাকার হইয়া যায়। স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সেই প্রান্তিক মানুষজন সারা বৎসরের দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া আনন্দে মাতিয়া ওঠে।

উৎসবপ্রিয় বাঙ্গালির বাঙ্গলা একদিন উৎসব মুখর ছিল। গ্রামবাঙ্গলা ছিল শান্তির নীড়। কবির ভাষায়, ' ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।' এখনও সেই গ্রামবাঙ্গলার উৎসব রহিয়াছে কিন্তু শান্তির নীড় আর নাই। কায়েমি স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকরা এই বঙ্গভূমির শান্তি বিনষ্ট করিয়াছে। দূষিত রাজনীতির বিষবাষ্পে বাঙ্গালি আজ দিশেহারা । চৌত্রিশ বৎসরের বাম রাজনীতি এই বাঙ্গলাকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে আর বর্তমান শাসকদল সেই শ্মশানে প্রেতনৃত্য শুরু করিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালির ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছে। বলিবার কেহ নাই, প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই। প্রতিবাদ করিলেই নামিয়া আসিবে মৃত্যু। সংবিধানের নিয়ম নাই, আইনের শাসন নাই। প্রতিবাদ করিলে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল মহোদয়কেও নানাভাবে অপদস্থ হইতে হয়। বিরোধীপক্ষের জনপ্রতিনিধিগণও সুরক্ষিত নহেন। নির্মম গণহত্যার প্রতিবাদ করিলে বিধানসভার অভ্যন্তরে তাহাদিগকে শারীরিক নিগ্রহ করিয়া থাকে শাসকদলীয় প্রতিনিধিগণ। প্রহসনে পর্যবসিত হয় সংবিধানতন্ত্র। বিরোধীপক্ষ তো বটেই, প্রতিবাদ করিলে স্বপক্ষেরও রেহাই নাই। চড়ক উৎসবের প্রাক্কালে বীরভূম জেলার রামপুরহাটের বগটুই গ্রামের স্বপক্ষীয় চৌদ্দজনকে শাসকদলের কর্তাব্যক্তিরা আগুনে দগ্ধ করিয়া মারিয়াছে বলিয়া অভিযোগ গ্রামবাসীদের । রাজ্যের সুশীল সমাজ এবং গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদমাধ্যম নিশ্চুপ রহিয়াছে। কারণ তাহারা তাহাদের মেরুদণ্ডটি শাসকদলের কাছে বন্ধক রাখিয়াছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাই এই রাজ্য এখন প্রেতের নৃত্যরাজ্যে পরিণত হইয়াছে। এই রাজ্যের বাহিরে এবং বিশ্বের দেশে দেশে লজ্জায় বাঙ্গালির মাথা হেঁট হইয়া পড়িয়াছে। এই লজ্জা হইতে মুক্তির জন্য চড়ক গাজনের এই উৎসবের ক্ষণে শিবঠাকুরের কাছে একটিই প্রার্থনা — এই নৈরাজ্যের, এই অপশাসনের অন্ত হউক। পুনরায় বাঙ্গালির বাঙ্গলা শান্তির নীড়ে পরিণত হউক।

সুভাষিতম্

নানৃতাৎ পাতকং কিঞ্চিৎ ন সত্যাৎ সুকৃতং পরম্।
বিবেকাৎ ন পরো বন্ধুঃ ইতি বেদবিদো বিদুঃ।।

অসত্য বিনা কোনো পাপ নেই, সত্য বিনা কোনো সুকৃতি নেই এবং বিবেক বিনা কোনো বন্ধু নেই — একথা জ্ঞানীগণ বলে থাকেন।

আবার বলতেই হচ্ছে ‘এরা জননীর গর্ভের লজ্জা, ঔরসের অপজাত সন্তান’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

১৩৬০ সাল (১৯৫৩), ৮ শ্রাবণ আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (সম্পাদক কাল ১৯২৩-১৯৪১) লিখেছিলেন, ‘এরা জননীর গর্ভের লজ্জা। ঔরসের অপজাত সন্তান’। ‘পশুর যুক্তি’ লেখা থেকে কথা ধার করেই এই লেখা। ‘রামপুরহাট নরহত্যা’ যা কিনা ‘বগটুই কাণ্ড’ বলে লঘু করার চেষ্টা হচ্ছে তার দিকে তাকিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের লেখা আজও প্রসঙ্গিক। ১৯৫৩ সালে ট্রাম আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি অত্যাচার হয়। সাংবাদিকরা তার কোপে পড়েন। গর্জে ওঠে সত্যেন্দ্রনাথের কলম। তখন পত্রিকা সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৯৪৪-১৯৫৯)। আজ সত্যেন্দ্রনাথ থাকলে রামপুরহাট নরহত্যা নিয়ে নিশ্চিতভাবে আবার ওই কথা বলতেন। রামপুরহাটের নরহত্যার ঘটনাক্রম সবাই জানেন। পুনরাবৃত্তি অপ্রয়োজনীয়। আদালতের নির্দেশে নরহত্যা তদন্তের ভার সিবিআই-এর হাতে। গ্রামবাসী আর বিরোধীরা আশাবাদী হত্যাকারীরা শাস্তি পাবেন। আমার মনে হয় ‘না আঁচালে বিশ্বাস নেই খাবার খেয়েছি কি না?’ ২০০০-এর পর থেকে রাজ্যে ৮টি বড়ো ঘটনার তদন্তে সিবিআই-এর ব্যর্থতা অপরিসীম। রাজ্য রাজনীতির জাঁতাকলে পড়ে সত্যেন্দ্রনাথের পত্রিকার প্রতিবাদী কণ্ঠ আজ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তারা এখন প্রায় ‘বাঁশী সংগীত হারা’। অনর্থকভাবে বিশ্লেষণ ধর্মী।

অনেকদিন আগেই এ রাজ্যে রাজনৈতিক নরহত্যা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ‘পথের শেষ কোথায়’ বলে প্রশ্ন তুলেছেন। বগটুই গ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রান্তদের পরিবারের মধ্যে ‘ডোল’ বিলি করে এসেছেন— চাকরি আর ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দোষীদের সত্বর ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিরোধীরা বলছেন, এসব মানুষের মুখ বন্ধ করার ফন্দি ফিকির। একসময় কংগ্রেস আর বাম নেতা মুখ্যমন্ত্রীরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকতেন। ঘটনা ধামাচাপা দিতে রাতের ঘুম নষ্ট করতেন। মমতা জমানাতেও সেই ট্র্যাডিশন চলেছে। ২০০০ থেকে ২০০৭-এর মধ্যে নানুর, আঙারিয়া, নন্দীগ্রাম আর নেতাইয়ে নরহত্যা হয়। আঙারিয়াতে ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা করে লাশ গায়েব করা হয়। রামপুরহাটে খুন করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে লাশ গায়েব হয়নি। শাসক সিপিএম দাবি করেছিল তৃণমূল সমর্থকরা অস্ত্র নিয়ে তাদের আক্রমণ করতে জড়ো হচ্ছিল। সে দাবি প্রমাণ হয়নি। এটাও প্রমাণ হয়নি সিপিএম ওই কাণ্ড ঘটিয়েছিল। ২০ বছর ধরে সে মামলা চলছে। ৪ জানুয়ারি যার বাড়িতে ঘটনা সেই বকতার মণ্ডল কিছুদিন আগে মারা গিয়েছে। প্রমাণের অভাবে প্রধান অভিযুক্ত বেকসুর খালাস পেয়ে এখন দলের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পার্টির সম্পাদক পদে বহাল হয়েছেন। সে তদন্ত চালিয়েছিল সিবিআই। মমতা তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ছোটো

আঙারিয়াতে বিচারের বাণী আজও ‘নীরবে নিভৃতে কাঁদে’। তার আগে জমি বিবাদ জেরে নানুরে ১১ জন সিপিএম বিরোধী ভূমিহীন কৃষককে হত্যা করা হয়। ২০১০ সালে ৪৪ জন আসামির যাবজ্জীবন সাজা হয়। রামপুরহাট নরহত্যায় যথারীতি পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বুদ্ধিজীবীরা সব বোবা আর কালা হয়ে গিয়েছেন! হলফ করে বলতে পারি এই ঘটনা বিজেপি শাসিত রাজ্যে হলে ‘সেন-বসু-প্রসন্নরা রে রে করে আসরে নেমে পড়তেন। ১৯৮৬-৮৭ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বানতলায় নারী নির্যাতন আর হত্যার ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন, ‘এরকম তো হয়ে থাকে’। মমতার গলাতেও আজ সেই সুর— ‘রাজ্যে এতগুলো গ্রামে কোথায় কী একটা ঘটেছে তা নিয়ে সারাদিন মৃতদেহের ছবি দেখাচ্ছে। কোনো কাজ নেই’। তবে ‘মমতা ম্যাজিকে’ রামপুরহাট নরহত্যার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত তৃণমূলের ব্লক নেতা আনারুল ধরা পড়েছে। আনারুল অবশ্য দাবি করেছে সে নির্দোষ আর আত্মসমর্পণ করেছে। রামপুরহাট নরহত্যা আর আমতার আনিসের মৃত্যুর পর ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটে ‘মমতা ম্যাজিক’ কতটা কাজ করে এখন সেটাই দেখার। মমতা কি বুঝছেন তাঁর কাছের মানুষরা তাঁর থেকে সরে যাচ্ছেন?

সিবিআই তদন্তের চৈত্র সেল একটার সঙ্গে একটা ফ্রি

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

দিদি,

বার বার আপনাকে চিঠি লিখছি। জানি, ব্যস্ততার শেষ নেই। তবু। এবার একটা অন্য প্রশ্ন নিয়ে এলাম। রাগ করবেন না প্লিজ। আসলে বাঙ্গলার এমন উজ্জ্বল দিন আগে আসেনি। গত মে মাসে দিদি আপনি তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। তার পরে সেই আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে আজ মার্চ পর্যন্ত সাত মাসে মোট ছ'টি মামলায় আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। আর দিদি, এতদিন আপনি বলে এসেছেন বাম আমলের চাপ নিতে হচ্ছে এখনকার সরকারকে। কিন্তু এবার আর তা বলা যাবে না। সারদা, নারদা ও সব নয়। নবম-দশম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ নিয়েই আপনার আমলে যে পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে তাতে আদালত সিবিআই দিয়ে তদন্ত করতে বলেছে। এর পরে হলদিয়া বন্দরে তোলাবাজি মামলায় সিবিআই। আর ভোটের পরে বিজেপি কর্মীদের যে ভাবে মারধর করা হয়েছে তা নিয়েও আদালত রাজ্য পুলিশের উপরে ভরসা না রেখে সিবিআইকে ডেকেছে তদন্ত করতে। সব মিলিয়ে ছ'টি সিবিআই তদন্ত চলছে রাজ্যে। মানে এই বগটুইয়ের ঘটনা নিয়ে। এরপরে ভাদু শেখ এবং আনিস খান হত্যাকাণ্ডের বিষয়টাও যেদিকে এগোচ্ছে তাতে আদালতে আবার তেমন কিছু বলে বসবে কি না কে জানে!

সব মিলিয়ে দিদি বাংলা নতুন বছরের আগে বেশ গর্ব হচ্ছে। সত্যিই এগিয়ে বাংলা। কোনও রাজ্য এর আগে এত কম সময়ে এতগুলো সিবিআই তদন্তের মুখোমুখি হতে পেরেছে কি না আমার জানা নেই। এ আমাদের রেকর্ড। এ যেন সিবিআই তদন্তের চৈত্র সেল। একটার সঙ্গে একটা ফ্রি।

ওদিকে বিজেপি বিধানসভায় বড্ড চেঁচাচ্ছে। ডান্ডা মেরে ঠাণ্ডা করা গেলে ভালো হতো। এই চিঠি যখন লিখতে বসেছি তখন বিজেপি বিধায়কদের বেশ কয়েকজন শুনলাম পেটানি খেয়ে হাসপাতালে। বেশ হয়েছে। এই রাজ্যে তৃণমূল করলেই রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না, আবার বিজেপি। হুঁ। ওসব চলবে না। আমরা নিজেদেরই ছাড়ছি না তাতে আবার বিরোধী স্বর। ভাদু শেখ তৃণমূল। সে খুন হয়েছে। তাঁর দাদা বাবর শেখ এক মাস আগে খুন হয়েছে। সেও ছিল তৃণমূল। এখন তার বদলা নিতে বগটুইয়ে আগুন লাগানো হয়েছে। তৃণমূলের লোকেরাই আক্রান্ত। দিদি, আপনি যেটা বলেছেন সেটাই ঠিক। আমরা কোনও রং দেখি না। সত্যিই তৃণমূল এখন রং দেখছে না। নিজেদের লোক হয়েছো তে কী হয়েছে। ভাগাভাগিতে ভাগ বসাতে এলে মরতেই হবে। আমরা রং দেখি না। যে ভাগ দেবে না কিংবা ভাগাভাগিতে নজর দেবে তার রং যাই হোক না কেন সে বিরোধী। আমরা পুড়িয়ে মেরে দেব। বলে দেবে টিভি ফেটে মরে গিয়েছে। তারপরে বলব গ্রাম্য বিবাদ। তারও পরে বলব পারিবারিক গোলমাল। তাতেও কাজ না হলে আমাদের নির্দেশেই আমাদের আনারুল গ্রেপ্তার হয়ে যাবে।

তবে দিদি আমার এই বাজে মনটায় কিছু বাজে প্রশ্ন এসে যায়। আপনি সেদিন বগটুই গ্রামে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, আনারুল ঠিক সময়ে বললে পুলিশ চলে আসত। আর তা হলেই এত মানুষের মৃত্যু হতো না। সুতরাং, আনারুল দোষী। আচ্ছা দিদি, আনারুল বললেই পুলিশ চলে আসত? আনারুল না বললে হবে না!

আর একটা প্রশ্ন। এত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরেও এই ভয়াবহ হানাহানি কেন? কেন এরকম জনকল্যাণমুখী সরকার প্রশ্নাতীত ভাবে তাদের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না? জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল পাওয়া মানেই অবশ্য সুশাসন পাওয়া নয়। সুশাসন বলতে আইনের শাসনেরও প্রতিষ্ঠাকে বোঝায়। ভয়হীন, নির্বিঘ্ন জীবনযাপন বোঝায়।

আপনি অবশ্য সব ক্ষতের মলম জানেন। আপনি জানেন বাঙ্গালি নারীকে মাসে ৫০০ টাকা দিয়ে দিলে সব ভোট কিনে নেওয়া যায়। সেই মহিলা প্রশ্ন করতেই ভুলে যায় যে, আমার সন্তানের কাজ নেই কেন? সন্তান কাজ পেলে তো মাকে মাসে মাসে ৫০০ টাকা সেই দিতে পারত। হয়তো আরও একটু বেশি। মাকে রাস্তায় গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হতো না। সেই মায়েদের মতো বগটুইও হয়তো আপনার দেওয়া টাকায়, চাকরিতে কান্না মুছে ফেলবে। কিন্তু বাংলা? □

আপনি অবশ্য সব ক্ষতের মলম জানেন। আপনি জানেন বাঙ্গালি নারীকে মাসে ৫০০ টাকা দিয়ে দিলে সব ভোট কিনে নেওয়া যায়। সেই মহিলা প্রশ্ন করতেই ভুলে যায় যে, আমার সন্তানের কাজ নেই কেন?

অতিথি কলম

রুচির শর্মা

উদ্যমী পুরুষকারের সঙ্গে পরিবারবাদের অসম সংগ্রাম

বিজেপির সঙ্গে লড়ে আদৌ সফল হতে গেলে নির্বাচন জেতার খিদে বাড়াতে হবে আর ভারতে যে জনতার আশীর্বাদেই বিজেপি একদলীয় গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে— তা মিথ্যে প্রমাণ হতে পারে তেমন কোনো সর্বভারতীয় দোলাচল এখন দেখা যাচ্ছে না।

উত্তরপ্রদেশ-সহ চার রাজ্যের চমকপ্রদ নির্বাচনী জয় আরও একবার প্রমাণ করল— বিজেপিকে লড়াইয়ে যদি সত্যিই হারাতে হয় সেক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের এমন নেতা দরকার যারা মোদী, যোগী বা অমিত শাহের মতো জয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও নিরলস পরিশ্রমের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার যোগ্য।

সাম্প্রতিক জয়কে বহু রাজনৈতিক পণ্ডিতই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা সযত্নে নির্মিত বিজেপির ভোট পরিচালনার ক্ষেত্রে এক নিখুঁত যান্ত্রিকতার কুশলী প্রয়োগ বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু গোটা উত্তরপ্রদেশের প্রচার পর্বের সময়টি আমি সেখানে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করার পর আমার বিশেষভাবে মনে হয়েছে, আদর্শগত ফারাক ছাড়াও নির্বাচনী জয়ের ক্ষেত্রে মোদী, যোগী বা অমিত শাহের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির খিদের বড়ো একটা পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য আবার কংগ্রেসের ক্ষেত্রে প্রকটভাবে নজরে পড়েছে। পার্থক্যটা পাঁচ প্রজন্মের পরিবারবাদীর সঙ্গে একদল নিষ্ঠাবান, শূন্য থেকে শুরু করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা রাজনৈতিক মানুষদের। কঠিন রাজনৈতিক লড়াইয়ের সময় পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, মাঝেমধ্যে অর্থহীন দার্শনিক বার্তা প্রদান, একঘেয়ে স্বার্থান্বেষী উদারবাদী ভাবমূর্তি প্রদর্শনের সঙ্গে প্রায়শই ময়দান ছেড়ে বিদেশ ভ্রমণে সরে পড়ার প্রবণতা তাদের প্রচেষ্টার আন্তরিকতাকেই নষ্ট করে দিয়েছে।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, প্রচারের তুঙ্গ অবস্থায় রাহুল গান্ধীর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হলে আপনার নিশ্চিত মনে হবে তাঁর মন যেন অন্য কোথায় রয়েছে। নিশ্চিতভাবে তিনি এই নির্বাচনী প্রচার, লক্ষ্য, জনমনে প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে কোনো এক উচ্চমার্গ থেকে কিছু বলবেন। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের আনাচে কানাচে যদি অমিত শাহকে পেয়ে যান তাহলে তাঁর কাছ থেকে অকাট্যভাবেই শুনবেন তাঁর চিন্তা ভাবনা অন্য কোথাও নয় কেবলমাত্র উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী কেন্দ্রগুলি নিয়েই প্রবলভাবে আবর্তিত হচ্ছে। তিনি যেন নির্বাচনী জয় সুনিশ্চিত করতে একটা ঘোরের মধ্যে আছেন। হ্যাঁ, বিজয় ক্ষুধার এই নজরে পড়ার মতো ফারাক দীর্ঘদিন ধরেই পরিলক্ষিত হচ্ছে তবে ইদানীং তা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে সেই দুস্তর ফারাক বিজেপিকে জাতীয় পর্যায়ে আটকানোর ক্ষেত্রে কঠিনতর হয়ে উঠছে।

আশ্চর্যের বিষয়, শুধু রাজনৈতিক দল নয় ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ তথাকথিত অভিজাত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং ভারতবর্ষের বাইরের বহু বিজেপির এই অগ্রসরমানতার বিরোধী শক্তি যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তাঁরা একটি নতুন তত্ত্ব নিয়ে আসার চেষ্টা করছে যে 'গণতন্ত্রের' পশ্চাদপসরণে বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দিচ্ছে বিজেপি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'চিন্তা চৌবাচ্চা' বলে পরিচিত ফ্রিডম হাউস লাগাতার পাঁচ বছর ধরে এক্ষেত্রে ভারতের অর্জিত মান পাঁচ বিন্দু নীচে নামিয়েছে। সদ্য তারা ভারতকে আংশিকভাবে মুক্ত গণতন্ত্রের দেশ বলে আখ্যা দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। কারণ হিসেবে তাদের ধারণা বিরোধীদের কণ্ঠরোধ ও মুসলমানদের ওপর চাপ দেওয়ার প্রসঙ্গই চিন্তার বিষয়।

কিন্তু বিষয়টা অত সস্তার নয়। যে কোনো একমাত্রিক গল্প ফাঁদলেই বিপুল বৈচিত্র্যের দেশ ভারতকে মাপা যাবে না। মার্কিনি-সহ অন্যান্যরা যতই জোরজবরদস্তির প্রয়োগে ভারতকে খাটো করার অপচেষ্টা করুক না কেন নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহের শিকড় গণতন্ত্রের মধ্যেই গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে। তাদের কাজের প্রাথমিক সূত্রই হচ্ছে গণতান্ত্রিক নৈতিকতা। তাঁরাই সেই প্রথম প্রজন্মের রাজনীতিবিদ যাঁরা একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে উঠে এসে অর্জন করেছেন বিশাল এই দেশের মানুষের মনে এক নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি এবং একই সঙ্গে নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিরলসভাবে পরিশ্রম করার ঈর্ষণীয় ক্ষমতা।

সকলেই জানেন বিজেপি হচ্ছে একমাত্র দল যাদের একটি সুনিশ্চিত ও সংহত আদর্শ রয়েছে, অন্তত সর্বোচ্চ স্তরের নেতাদের মধ্যে তো বটেই। এক্ষেত্রে মোদী এবং তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ মনে করেন কংগ্রেসের সব থেকে বড়ো ভুল বরাবর পাশ্চাত্য ধারণা ও মডেলগুলির প্রতি নির্ভেজাল আনুগত্য। অন্যদিকে বিজেপি বরাবর বলে আসছে এবং কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করছে বিশ্বের দরবারে ভারতের বিশিষ্টতাকে প্রতিষ্ঠিত করার এই নির্ঘোষ দিয়ে 'Hindu beacon' অর্থাৎ জেগে ওঠার ডাক দিচ্ছে। আর দল এ বিষয়ে দিনের পরদিন আশ্বস্ত হয়ে উঠছে যে বিশ্ব ক্রমশ এই ঘোষণাকে স্বীকার করে নিচ্ছে। ভারতের এই বিশ্ববীক্ষাকে তারা মান্যতা দিচ্ছে। মোদী তাঁর লক্ষ্য পূরণের পথে

বাড়তি উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বেশ কিছুদিন ধরেই মোদী মুসলিম সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ কিছু আলাদা করে বলছেন না। সাম্প্রতিক পূর্ব উত্তরপ্রদেশের শোনভদ্র জেলা যাকে অতীতে ভারতের সুইজারল্যান্ড বলা হতো সেখানকার এক বক্তৃতায় মোদী রামমন্দির বা অন্য কোনো একান্ত হিন্দু সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখই করলেন না। সেগুলি তিনি যোগী বা অন্যান্য সহ-যোদ্ধাদের জন্য রেখে দিলেন।

আমার ধারণায় ওই ধরনের ধর্মীয় বিতর্কগুলির তেমন প্রভাব আমি বহু ভোটারের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি— বিশেষ নেই। যথাযথ ভাবেই মোদী তাঁর নজর বিশ্বে ভারত সংক্রান্ত অন্য গুরুতর বিষয়ের ওপরে নিবদ্ধ রাখেন।

সাম্প্রতিক উদ্ভূত যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আজকাল পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কঠিন হয়ে পড়ায় তিনি ইউএপি, সৌদি আরব ও অন্যান্য মুসলমান দেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বাড়াতে আগ্রহী। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গেও আজ ভারতের সুসম্পর্ক। Gulf co-operation Council-এর অন্তর্গত দেশগুলিও বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার হয়ে উঠেছে।

আজকের মোদী অনুরাগীরা এই বিষয়গুলি এড়িয়ে নিজেদের বরাবরের আরাধ্য ভারতমাতার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের বিষয়ে বেশি উদ্যোগী হয়েছেন। এখন অতীতের কঠিন অর্থনৈতিক সংস্কারগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রচেষ্টা থেকে পিছিয়ে তিনি কিছুটা Wellfare State বা কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বেশি মনোযোগ দিয়েছেন।

বিশাল নির্বাচকমণ্ডলী তাঁদের নিত্যদিনের জীবনযন্ত্রণায় যে সমস্ত অসুবিধের মুখোমুখি হচ্ছেন সরাসরি তার সমাধানের দিকে দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব যে নিরলস পরিশ্রম করে সমাধানের চেষ্টা করছেন— এই ছবি জনমনে মোদী সম্পর্কে এক উচ্চ ধারণার জন্ম দিয়ে চলেছে। এই প্রেক্ষাপটে কোনো দিন ছুটি না নেওয়া প্রধানমন্ত্রী বিদেশ ভ্রমণে পারদর্শী রাহুল গান্ধীকে সফলভাবে জনমনে গাড্ডায় ফেলে দিয়েছেন। প্রমাণ করেছেন এরা গরিব সম্পর্কে উদাসীন।

রাহুলের বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে প্রায়শ প্রশ্ন করা হয় তিনি কেন রাজনীতিতে অত দেরিতে এলেন? তিনি জবাব দেন তাঁর বাচ্চা- কাচ্চাদের একটু সাবালক হওয়ার সময় দিয়ে তবেই তিনি এসেছেন। অবশ্যই একজন সাধারণ ঘর ও পাবলিক লাইফের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী মহিলার তরফ থেকে উত্তরটি যথাযথ কিন্তু রাজনীতিকে জীবনের ব্রত করে নেওয়া একজন সর্বক্ষণের রাজনৈতিক যোদ্ধার নয়। এর পরও কি বুঝতে অসুবিধে হয় কংগ্রেস প্রায় জীবন্ত অবস্থাতেই আজ মৃত্যুর মুখ অতি নিকটবর্তী বলেই প্রত্যক্ষ করছে?

মোদীর কাছের মানুষেরা জানাচ্ছেন, রাজনীতি ছাড়া মোদীর অন্য একমাত্র পথ হচ্ছে যোগাভ্যাস। আজকাল তিনি যোগনিদ্রা রপ্ত করতে পরিশ্রম করছেন। এই বিশেষ যোগ্যভ্যাস শরীর ও মনের মধ্যে এক শান্ত সমাহিত ভাব সৃষ্টি করে। এমনকী নিদ্রার প্রয়োজনীয় সময়ও কমিয়ে আনার ক্ষমতা রাখে। এতে সাফল্য এলে তাঁকে আরও কম ঘুমোতে হবে, তাতে কাজের সময় বাড়াতে পারবেন। তিনি ভারতের বাইরে বা ভারতের মধ্যে যেখানেই থাকুন না কেন চেষ্টা করেন বেশি রাত হলেও দিল্লির বাসভবনে ফিরতে যাতে তাঁর সামান্য খাওয়া-দাওয়া ও যোগাভ্যাসে কোনো ছেদ না পড়ে। এই রুটিন অনুযায়ী তাঁর পূর্ণ উদ্যমে কাজের সময় ১৮ ঘণ্টা।

অন্যদিকে শাহও সেই প্রথম প্রজন্মের একই থান কাপড় কেটেই তৈরি। সম্পূর্ণ মগ্ন এক মানুষ। সারা ভারতের জনতার ভোট দেওয়ার ধরন ঠিক কীরকম তা নিয়ে তাঁর মনের অভ্যন্তরে এক বিশাল চলমান গবেষণাগার ও তার ফলাফল রয়েছে। প্রায়শই তিনি নিজেদের মধ্যে পরিকল্পনা, মতবিনিময় নিয়ে সভা ডাকেন রাত ৪টের সময়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবাদী দলের অখিলেশ ইউপি-তে একটি অনুপ্রাণিত লড়াই দিয়েছেন। তাঁর সভাগুলিতে বিপুল সমাবেশও হয়েছে। কিন্তু তিনি প্রচার শুরু করেছেন মাত্র অক্টোবর মাসে। হয়তো আগে করলে কিছু হেরফের হতে পারত।

দেখুন, পঞ্জাব জেতার জন্য কেজরিওয়াল কিন্তু দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কয়েক মাস আগে পশ্চিমবঙ্গে মমতা ছলে-বলে-কৌশলে ভয়ংকরভাবে বিজেপি বিরোধিতায় রাত-দিন এক করার চেষ্টা করে ফল পেয়েছেন। একই সঙ্গে বিপুল স্বৈরতান্ত্রিক তকমা ও সরকারি শাসনযন্ত্র অপব্যবহারের তকমাও জুটিয়েছেন। তাই বিজেপির সঙ্গে লড়ে আদৌ সফল হতে গেলে নির্বাচন জেতার খিদে বাড়াতে হবে আর ভারতে যে জনতার আশীর্বাদেই বিজেপি একদলীয় গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে— তা মিথ্যে প্রমাণ হতে পারে তেমন কোনো সর্বভারতীয় দোলাচল এখন দেখা যাচ্ছে না।

(লেখক বিশিষ্ট গবেষক এবং রাজনৈতিক নিবন্ধকার)

শোকসংবাদ

মালদহের গাজোল থানার দেবীদহ গ্রামের সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী ও স্বস্তিকা পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক সন্তোষ মণ্ডল গত ২২ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৪ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তার ৪ পুত্রই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।

* * *

বাঁকুড়া নিবাসী ভারতীয় জনতা পার্টির প্রবীণ কার্যকর্তা, ভারতীয় জনসঙ্ঘের সময় থেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এবং সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক, সুবক্তা, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক গুণময় চট্টোপাধ্যায় গত ৬ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। সঙ্ঘের সমস্ত সংগঠনের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। স্বস্তিকার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। বাঁকুড়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শুরু করা দুর্গাপূজা, বঙ্গবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতি বছর সম্পন্ন করার গুরু দায়িত্ব তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত চালিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র, পুত্রবধূ, দুই কন্যা, জামাতা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

প্রশ্নের মুখে সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্প

রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পের গুরুত্ব অসীম। কন্যাশ্রী প্রকল্প নাকি বাল্যবিবাহ রোধ করে মেয়েদের আর্থিক স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে দেবে— এমন কত কিছুই শোনা যায়। যদিও বাস্তব চিত্রটা বেশ করুণ।

সম্প্রতি রেজিস্ট্রার জেনারেল কর্তৃক স্যাম্পেল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ২০১৯-এর পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে মেয়েদের বিবাহের গড় বয়েসের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ বেশ পিছনের সারিতে। তালিকার শীর্ষে আছে পঞ্জাব ও দিল্লি। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স ২১ বছর, সেখানে পঞ্জাবে এই অঙ্কটাই ২৪.২ বছর, তার সামান্য কম দিল্লি, ২৪.১ বছর।

নারী কল্যাণ ও উন্নয়ন দপ্তরের অধীন এই প্রকল্পে মূলত আর্থিকভাবে দুর্বল অর্থাৎ যাঁদের বার্ষিক আয় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার কম এমন ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সি মেয়েরাই মাসে পাঁচশো টাকা পেয়ে থাকেন। আঠেরো বছর বয়স হলে এই সামাজিক প্রকল্প অনুযায়ী তাঁদের এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়ার কথা। মূলত বাবা-মায়েরা যাতে প্রাপ্তবয়স্ক না হলে মেয়েদের বিয়ে দিতে উদ্যত না হন, তাঁদের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যেতে পারেন, তার দিকে লক্ষ্য রেখেই কন্যাশ্রীর মতো সামাজিক প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান বলছে, বছরে ১৮ লক্ষ মেয়ে এই মাসিক অনুদান পান, সাড়ে তিন লক্ষ মেয়ে এককালীন অনুদানও পেয়ে থাকেন বছরে।

এই দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা এক সরকারি পরিসংখ্যানে উল্লেখ করে জানিয়েছেন, গত বছরে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন ৭২ লক্ষ ৪১ হাজার ৭৮১ জন মেয়ে। চলতি অর্থবছরে তা এখনো পর্যন্ত ৭৬ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছেছে। চলতি বর্ষে প্রায় ৩১ লক্ষ মেয়ের কাছে এই প্রকল্পের আওতায় আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও মন্ত্রী জানিয়েছেন। এখন প্রশ্ন যে রাজ্যের প্রায় সিংহভাগ টিনএজার মেয়ে অর্থাৎ প্রায় এক কোটি মেয়ে এমন একটি অর্থনৈতিক প্রকল্পের সুযোগ নিল, সেখানে দেশের মধ্যে অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহে পশ্চিমবঙ্গের স্থান এতো পেছনে কেন? একি শুধু মানুষের সামাজিক অসচেতনতার কারণ? নাকি সরকারি পরিসংখ্যান আসলে সঠিক তথ্য দিচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এই সম্ভাব্য কারণগুলোর কোনোটাই নাও হতে পারে।

কন্যাশ্রী প্রকল্পকে কেন্দ্র করে জেলায় জেলায় কিছু কর্মসংস্থানেরও বন্দোবস্ত করেছে তৃণমূল সরকার। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই এখানেও নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয়। বরং সরকারি টাকা নয়ছয় করে তৃণমূলিদের পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ফলে আর্থিক দুর্নীতি যেভাবে রাজ্যটাকে গ্রাস করেছে, তার থেকে কন্যাশ্রী প্রকল্পও কোনো ভাবেই মুক্ত নয় বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

> **মেয়েদের বিবাহের গড় বয়েসের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ বেশ পিছনের সারিতে। তালিকার শীর্ষে আছে পঞ্জাব ও দিল্লি। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স ২১ বছর, সেখানে পঞ্জাবে এই অঙ্কটাই ২৪.২ বছর, তার সামান্য কম দিল্লি, ২৪.১ বছর।**

ফলে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা কতটা এরাজ্যের কন্যাদের কাছে পৌঁছচ্ছে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান তাঁরা। মূলত এই প্রকল্পের ব্যর্থতার কারণেই যুবতী মেয়েদের সামাজিক সুরক্ষার দিকটি এরাজ্যে গুরুতর আকার নিয়েছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন তো আছেই, তার সঙ্গে এ রাজ্যের মেয়েরা যে সামাজিকভাবে অন্ধকারের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে, উল্লিখিত পরিসংখ্যানে তার আভাস আছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত। তথ্য-পরিসংখ্যানে এও দেখা গিয়েছে যে, সারা ভারতে মহিলাদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স আঠারো হলেও এরাজ্যে আঠারো বছরের আগেই ৩.৭ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ৪৫.৯ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হচ্ছে ১৮ বছর হওয়ার পর, কিন্তু ২১ বছর হওয়ার আগে। ২১ বছর হওয়ার পর বিয়ে হচ্ছে ৫০.৪ শতাংশ মহিলার। এই পরিসংখ্যানের নিরিখে সারা দেশের তুলনায় এরাজ্য রীতিমতো পিছিয়ে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, এই পরিসংখ্যান কিন্তু কোভিড-পূর্ব পরিস্থিতির। কোভিডে সারা দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরই কিছুটা অবনমন হয়েছে। ফলে অল্প বয়স্কা মহিলাদের বিবাহের ক্ষেত্রে অন্তত পশ্চিমবঙ্গের ছবিটা যে অত্যন্ত ভয়াবহ হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। বিশেষজ্ঞরা এও মনে করেন, রাজ্যের ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট সাফল্য পেলে এই শোচনীয় পরিস্থিতি কখনোই তৈরি হতো না। □

পোড়া মানুষের গন্ধে মাতাল শান্তির ‘মরূদ্যান’ পশ্চিমবঙ্গ

সুজিত রায়

কী খুঁজছো? মেরুদণ্ড?

বড়ো সুবোধ প্রশ্ন।

এই বলে ঝাউপাতা ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমোতে গেলেন নবজাতক কবি ও সাঙ্গপাঙ্গরা! কৌশিকী অমাবস্যায়, শুরু হলো নতুন পালা, কোনো চরিত্রই কাল্পনিক নয় সব চরিত্রই পুড়ে পুড়ে ছাই...

নিদ্রাহীন লোকটা ছাইয়ের স্তূপ সরিয়ে সরিয়ে দেখে মেয়েটি বড়োজোর ক্লাস সিক্সের ছাত্রী কেউ-বা তার চাচি, কেউ-বা নানি...

কী খুঁজছো মেরুদণ্ড?

বড়ো সুবোধ প্রশ্ন!

এই বলে আমার মতোই ঘুমিয়ে পড়ল ঝাউপাতারা...

গত এক দশক ধরে জাগে। তারপর তপ্ত আগুনের হলকাস্রোতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিংবা ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়। না হলে জেগে উঠে বসলেই ঝাউপাতারাও মেরুদণ্ড খুঁজবে। নিজেদের অথবা অন্য কারও।

গত এক দশক ধরে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালি দু’ গরাস বিনি পয়সার চাল, একমুঠো টাকা, নীল-সবুজ সাইকেল আর ভিক্ষের পাঁচশো টাকা পেতে পেতে পেতে পেতে হারিয়ে ফেলেছে মেরুদণ্ডটাই। আর তাই গ্রামবাঙ্গলার সবুজ বনানী ফুঁড়ে আকাশ ছোঁয়া আগুনের ফুলকি। আর তাই গরিবের খড়কুটো জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে ওড়ায় শুধু চোখ জ্বালানো ধোঁয়া। সেই ছাই সেই ধোঁয়ার আচ্ছন্নতা কেটে যাবার পর খুঁজে পেতে পরম যত্নে তুলে আনতে হয় পুড়ে খাক্ হয়ে যাওয়া মেরুদণ্ডগুলো যেগুলোর শরীরে কোনো তকমা লাগানো যাবে না। না নামের। না রাজনীতির। ‘ভি ফর ভিক্ট্রি’ বলে নবান্নের আকাশচুম্বী সুদৃশ্য বাগানে সোল্লাসে আওয়াজ উঠবে। আর বীরভূমের বগটুই গ্রামের মনিয়া, জাহানারা, আলম, নুসরতরা শিউরে উঠবে ভি ফর ভায়োলেন্সের তীব্রতায়। দরজায় খিল আঁটলেও আগুন তাদের আলিঙ্গন করে। সেই অগ্নিশিখার লক্ষ্য মানুষের মেরুদণ্ড। আর কলকাতা থেকে হেলিকপ্টার উড়ে যায় মানুষকে বোঝাতে— বেচো বেচো... মেরুদণ্ড বেচো... নয়তো পুড়ে যাও... পুড়ে কালো হয়ে পড়ে থাকো মাটির গভীরে অশনাক্ত কাঠকয়লা হয়ে।

২১ মার্চ বগটুই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখ যখন খুন হলেন, তখন সবে সন্ধ্যা নেমেছে। তখনও তার দেহ পড়ে রয়েছে জাতীয় সড়কের লাগোয়া চায়ের দোকানের সামনে। কথা চাউর হতে না হতেই ময়দানে হাজির অন্য ভাদু শেখরা। না, তারা ভাদুর মতো তাবড় নেতা নয়। না ওরা ভাদুর মতো আচমকা বড়োলোক হয়ে ওঠা মনিষ্যিও নয়। না, ওরা কেউ ডাকাত নয়। খুনি নয়। ধর্ষক নয়। দশ-বারোটা তাজা নারীদেহ হাতের মুঠোয় পেয়েও এরা কেউ তাদের ধর্ষণ করেনি। কারণ নবান্নের ভাষণকে সত্যি প্রমাণ করতে হবে— এ রাজ্যে নারী নির্যাতন দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম। এরাজ্যে নারী ধর্ষণের সংখ্যা দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম। এরাজ্যে ডাকাত নেই। লুটেরা নেই। ছিনতাইবাজ নেই।

বাংলা এখন ‘দেশি বাংলা’। এখানে আইন খুঁজবেন না। এখানে ন্যায় খুঁজবেন না। সততা সভ্যতা খুঁজবেন না। এখানে মনুষ্যত্বের বিচার করবেন না। বরং বেঁচে যাবেন— যদি রাজনৈতিক ড্রাকুলাদের কাছে মেরুদণ্ডটা বেচে দেন। ব্যাস। আর কী চাই!

ঠিকই তো, নেই তো। সরকারের খাতাপত্র তো তাই বলে। থাকবে কেন? তাদের সবাই তো এখন পাড়াতুতো রাজনৈতিক দাদা। ভাদু শেখ কিংবা ভাদু শেখের বিরোধী শিবিরের নেতা-নেত্রী।

গত এক দশকে অপরাধ জগতের চোহারাটাই বদলে গেছে এ রাজ্যে। টোটাল পলিটিসাইজেশন অব ক্রিমিনালস। অপরাধীদের সম্পূর্ণ রাজনীতিকরণের অথবা রাজনীতিকে পুরোপুরি অপরাধীকরণের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গেছে শাসকদল এবং সরকার। আগেও হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে হয়েছে। কংগ্রেসের আমলে হয়েছে। বামফ্রন্টের আমলেও হয়েছে। গত ৫৪ বছর ধরে বাঙ্গলা হয়ে উঠেছে অপরাধের স্বর্গরাজ্য। এখন রাজ্যে বসবাস দুটি জাতের মানুষের। রাজনীতিবিদদের রক্তচক্ষুতে শাসিত মেরুদণ্ডহীন বাঙ্গালি। আর বাঙ্গালির কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া রাজনীতিবিদ থুড়ি অপরাধী বাঙ্গালি।

যাঁরা বলবেন, বগটুই গ্রামের ‘গণহত্যা’র ঘটনা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র, তাঁদের অনুরোধ করব, বামফ্রন্টের আমল থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আশ্রমিক ধ্যানবিন্দুক্ষেত্র বীরভূম, জাগ্রত সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ-ধন্য বীরভূমের অপরাধের মানচিত্রটার ওপর নজর ফেলতে।

১৯৮২ সালে ময়ূরেশ্বরের কোটা গ্রামে

ফঃ ২

গানের আসরে বাউল- ফকিরদের ৯ জনকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল। তাঁদের অপরাধ, তাঁরা গানের মধ্যে বারবার 'প্রভু' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। রাজনীতির পোষ্যরা শব্দটির অতি ব্যবহার সহ্য করতে পারেনি।

আঠেরো বছর পর ২০০০ সালের ২৭ জুলাই সুচপুরে ১১ জন ভূমিহীন খেতমজুরকে পিটিয়ে খুন করে শাসকদল সিপিআইএমের ক্যাডাররা। ২০০১, রামপুরহাটের দখলবাটিতে গ্রাম দখলের লড়াইয়ে পাল্লা দেওয়ার জন্য বোমা বাঁধতে গিয়ে আচমকা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ১১ জনের।

এরপর লাভপুর। বিতর্কিত রাজনীতিবিদ মনিরুল ইসলামের সালিশি সভায় জেরিনা বিবির তিন ছেলে বাটুন, ধানু ও তারুক শেখকে পিটিয়ে মারা হয়।

এবার আসুন আমরা ফিরে যাই ২০১০-এর বগটুইতে। বোমা বাঁধতে গিয়ে সাত বহিরাগতের মৃত্যু। একই বছরে পাপুড়ি গ্রামে পাঁচ সিপিআইএম সমর্থককে পিটিয়ে হত্যা।

না, এসব দেখেও যেন ভুল করেও বলে বসবেন না— পশ্চিমবঙ্গ অপরাধীদের এবং অপরাধের স্বর্গরাজ্য। একদম না। বললেই পুড়িয়ে দেওয়া হবে মেরুদণ্ড।

ভাদু যেদিন মারা গেল বোমার আঘাতে সেদিন রাজ্য কেমন ছিল? আসুন দেখে নিই।

ওইদিনই এক স্কুলশিক্ষক তাঁর সাত বছরের শিশুছাত্র রাকেশ কাহারকে খুন করে, কারণ শিশুটির বাবা তার দেওয়া ধারের দু' লক্ষ টাকা শিক্ষকমশাইয়ের কাছে চেয়েছিলেন। ঘটনাটা উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার বেড়াচাঁপা গ্রামের। একই দিনে পশ্চিম বর্ধমানের কাটোয়ার পানুহাট বৈদ্যপাড়ায় একটি বন্ধ ঘরের মধ্য থেকে উদ্ধার করা হয় বাবা-মা-মেয়ের মৃতদেহ। বাবা নঈম শেখ, মা শেফালি খাতুন, মেয়ে পিঙ্কি খাতুন।

উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি। পয়লা ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ১৯ মার্চ ২০২২— এই সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পাঁচ-পাঁচটি খুনের ঘটনা ঘটে। আগরপাড়া, জয়প্রকাশ কলোনির রাহুল ঝাকে বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিত্যক্ত জমিতে কুপিয়ে খুন করা হয় ১ ডিসেম্বর। ১৯ ও ২৬ ডিসেম্বর পানিহাটির গিরিবালা গঙ্গাঘাট থেকে উদ্ধার হয় দুটি মৃতদেহ। প্রথমজন শেখর পাল। দ্বিতীয়জন শিবনাথ দাস। এদের খুন করে গঙ্গাপাড়ের নরম মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। সবকটি ঘটনাই ঘটেছে খড়দহ থানা এলাকায়। সিরিয়াল হত্যার পরবর্তী ঘটনা ঘটে ১৩ মার্চ আগরপাড়া নর্থ স্টেশন রোডে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয় শাসক দলের কাউন্সিলার অনুপম দত্তকে। মাত্র ছদিন পর ১৯ মার্চ নয়াবস্তি এলাকায় প্রকাশ্যে চপার দিয়ে কোপানো হয় মহম্মদ তারমানকে। সেই খড়দহ পুলিশের অধীনস্থ এলাকাতেই।

২০ মার্চ বেহালা পর্ণশ্রী এলাকার আর্য সমিতির মাঠে অর্ধদগ্ধ এক তরুণীকে উদ্ধার করা হয়। তরুণীর অভিযোগ, তাকে নগ্ন করে একদল দুষ্কৃতী মোবাইলে ছবি তোলে। তারপর তার শরীরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

কিছুদিন আগেই রাজ্য জুড়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল বাম ছাত্র নেতা আনিস খানের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। এক একটি ঘটনা ঘটে। নবান্ন থেকে 'বাণী' আসে। আমরা আশ্বস্ত হই। এই ভেবে— আমার তো কিছু হয়নি।

এরকম ভাবনা তো তখনই আসবে যখন আর আপনার মেরুদণ্ডটাই থাকে না। বিক্রি হয়ে যায়। অথবা বন্ধক দিয়ে দেন শাসক দলের কাছে। যেমন দেন দু-চার জন শিল্পী, কবি, অভিনেতা, অভিনেত্রীরা। যেমন দেন দলবদলু 'জো হুজুর' নেতা-নেত্রীরা। যেমন দেন দলদাস পুলিশ এবং ঝকঝকে আইপিএস, আইএএস-রা।

যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন— বাঙ্গলায় কি এরকম সন্ত্রাস চলতেই থাকবে? তাঁদের করজোড়ে বলব— একটু ভাবুন। একটু ভাবতে শিখুন। হিটলার তাঁর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলিতে যত ইহুদিদের ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দিতেন, সবাইকেই কি মেরে ফেলতেন? না। তাদের দেখানো হতো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের নারকীয়তা। তাদের প্রতিটি রোমকূপে ছড়িয়ে দেওয়া হতো ভয়ের বিষ— যা বলব তাই কর। নয়তো মর। হয় বল, হীরকের রাজা ভগবান। নয়তো মেনে নাও রাজার মৃত্যুবাণ। গোয়েবলস তো ছিলেনই। প্রচার সর্বস্বতা যাঁর মূলধন। তখন ছিল এক গোয়েবলস। এখন লক্ষ লক্ষ গোয়েবলস। পাড়ায় পাড়ায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে। লাইটপোস্টের ব্যানারে, হোর্ডিং-এ, নিয়নের ঝলসানিতে, দেওয়াল ছবিতে, পোস্টারে, পথসভার গানে, কবিতায়, নাটকে, ঝিলিক তোলা বঙ্গভূষণ বঙ্গবিভূষণ পুরস্কার প্রদানের মঞ্চে, মাইকে স্লোগানে। —হীরকের রাজা ভগবান।

এও এক রাজনৈতিক এক্সপেরিমেন্ট। রাজ্যের দশকোটি মানুষকে গিনিপিগ বানিয়ে গত কয়েক দশক ধরেই চলছে এই গবেষণা। এখন শুরু হয়েছে তার চূড়ান্ত পর্যায়। বেনিভোলেন্ট ডিকটেটরের মায়াজাল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গোটা রাজ্যের আবহাওয়ায়। সেই হাওয়ায় সর্বদাই রিনরিন করে বেজে চলেছে একটাই গানের লাইন— কেউ কথা বোল না— শব্দ কোরো না। কথা বললেই ঘ্যাচাং ফুঃ। রানি জেগে আছেন ভরতুকির থলে হাতে। ভরতুকি নাও। ঘরে গিয়ে খেয়ে দেয়ে মোষের মতো ঘুমোও। বগটুই গ্রামে কেন আগুন লাগল? কে আগুন লাগালো— এত প্রশ্ন করার তুমি কে হে দু' পয়সার নাগরিক?

হিসেব বলছে, বগটুই গ্রামে ভাদু শেখ-সহ ১৪ জনের গণহত্যার সমসাময়িক কালেই রাজ্যে মদ বিক্রি বাবদ লক্ষ্মীলাভ হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। শুধু হোলির আগের দিনই মদের ব্যবসা হয়েছে ৭০ কোটি টাকার। এর মধ্যে সিংহভাগ দেশি মদ অর্থাৎ 'বাংলার মদ'। বগটুইতে কত মদ বিক্রি হয়েছিল রানি-মা?

ও হিসেবটা এখন জানা যাবে না। কারণ এক ডজন মানুষের পোড়া চামড়ার গন্ধে চাপা পড়ে গেছে দেশি মদের গন্ধ। এখন শুধু শোঁকা যাক তারিয়ে তারিয়ে ওই পোড়া চামড়ার গন্ধটাই, কারণ বাংলা এখন 'দেশি বাংলা'। এখানে আইন খুঁজবেন না। এখানে ন্যায় খুঁজবেন না। সততা সভ্যতা খুঁজবেন না। এখানে বিবেকের সন্ধানে হাতড়াবেন না। এখানে মনুষ্যত্বের বিচার করবেন না। বরং বেঁচে যাবেন— যদি রাজনৈতিক ড্রাকুলাদের কাছে মেরুদণ্ডটা বেচে দেন। ব্যাস। আর কী চাই!

(প্রবন্ধের শুরুতে ব্যবহৃত কবিতাটি ফেসবুক থেকে সংগৃহীত। সংগত কারণেই কবির নাম উহ্য রাখা হলো।)

এত রক্ত বাঙ্গালি আর দেখতে চায় না

বগটুই কাণ্ডের পর নেটিজেন মহলে প্রশ্ন উঠেছে, নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় যে বুদ্ধিজীবীরা রাস্তায় নেমেছিলেন তারা এখন কোথায়? এটা জেনে রাখা ভালো, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনওদিন ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে তাঁবেদার মিডিয়া কিংবা সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীরা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ায়নি।

পরিচয় গুপ্ত

রামপুরহাটের বগটুই গ্রাম। যাকে নিয়ে আজ রাজ্য-রাজনীতি উত্তাল। কিন্তু বগটুই হোক বা পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'; বিতর্কের প্রসঙ্গে এলে বারবার একশ্রেণীর বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবী আঙুল তোলেন, গুজরাটের দিকে। গুজরাটের 'গোধরা'।

২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। গোধরা শহরের বাইরে হিন্দু তীর্থযাত্রীবাহী একটি ট্রেনে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। আহমেদাবাদগামী সবরমতী এক্সপ্রেস গোধরা স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করা মাত্র কেউ চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল। তারপর একটি কামরায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে ৫৯ জনের মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনাটিকে হিন্দুদের উপর আক্রমণ ধরে নিয়ে গুজরাট রাজ্যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই দাঙ্গা চলে। এই দাঙ্গায় ২০০০ জন মারা যান। এবং ১৫০,০০০ জন গৃহচ্যুত হন। ধর্ষণ, অঙ্গচ্ছেদ ও অত্যাচারের ঘটনাও ঘটতে থাকে। গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমনন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দাঙ্গাকারীদের পরিচালনা করার এবং তাদের হাতে মুসলমান-অধিকৃত সম্পত্তির তালিকা তুলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। গোধরা কাণ্ডে প্রাণদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত ১১ জনের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয় গুজরাট হাইকোর্ট। একই সঙ্গে রাজ্য সরকার এবং রেল মন্ত্রককে নির্দেশ দেওয়া হয় গোধরা কাণ্ডে নিহতদের নিকট আত্মীয়কে

১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহের বিরুদ্ধে কোনো তথ্যই প্রমাণ হয়নি।

কিন্তু গুজরাটে তো একটা গোধরা। কিন্তু বঙ্গ রাজনীতির ইতিহাস বলছে, এই প্রথম নয়, এর আগে বহুবার রাজনৈতিক হিংসার নগ্ন রূপ দেখেছে এই বাঙ্গলা। বিশেষ করে বাম শাসনের ৩৪ বছরে একের পর এক গণহত্যায় কলঙ্কিত হয়েছে ইতিহাসের পাতা। চলুন উলটে দেখি সেইসব রক্তাক্ত পৃষ্ঠা।

১৯৮২ সাল। ৩০ এপ্রিল। কসবায় প্রকাশ্য দিবালোকে ১৭ জন আনন্দমার্গীকে দিনে-দুপুরে হত্যা করা হয়। অভিযুক্ত, সিপিআই (এম)। যদিও এই অভিযোগের কোনো সারবত্তা পাওয়া যায়নি তদন্তে। শুরুতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এই নৃশংস ঘটনার গুরুত্ব দিতে চাননি। পরে, তদন্ত কমিশন হয়। অথচ, কোনো তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে সিপিআই (এম)-এর কোনও নেতা বা কর্মী এই ঘটনার জন্য দোষী বলে প্রমাণিত হননি।

এরও বহু আগে বঙ্গ রাজনীতির ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে নৃশংস রাজনৈতিক হিংসার নজির 'সাঁইবাড়ি' হত্যাকাণ্ড। রাজ্যে তখনও বামেরা পুরোদমে ক্ষমতায় আসেনি। সে সময় রাজ্যে ক্ষমতায় যুক্তফ্রন্টের সরকার। সিপিএম সেই সরকারের শরিক দল। ততদিনে কংগ্রেস ক্ষয়িষ্ণু। বর্ধমানে কংগ্রেসের দুর্গ আটকে রেখেছিল শহরের বুকে এই 'সাঁইবাড়ি'। তথাকথিত 'সিপিএমের গুন্ডা'দের সামনেও মাথা না নুইয়ে কংগ্রেসি রাজনীতিতে ভরসা রেখেছিলেন সাঁইরা। ১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ বর্ধমান শহরের প্রতাপেশ্বর শিবতলা লেনের বাড়িতে ঢুকে সাঁইবাড়ির তিন সদস্যকে খুন করা হয়। ছেলের রক্তমাখা ভাত খেতে বাধ্য করা হয় তাঁদের মাকে। খুন হন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ছাত্র জিতেন রায়ও। অভিযুক্ত সিপিএমের তৎকালীন দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা নিরুপম সেন, বিনয় কোঙাররা। যথারীতি কোনো কিছুই প্রমাণ হয়নি। বাঙ্গলার ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যাগুলির মধ্যে একটি হলো 'মরিচঝাঁপি' হত্যাকাণ্ড। পুলিশ দিয়ে পরিকল্পিতভাবে উদ্বাস্তুদের হত্যালীলা। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনা। তখন সদ্যই রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বামেরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের জনতা সরকার। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দণ্ডকারণ্য হয়ে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রায় দেড় লক্ষ উদ্বাস্তু। কোনওরকম সরকারি সাহায্য ছাড়াই ওই দ্বীপে নিজেদের বাসস্থান গড়ে তোলেন ওই উদ্বাস্তুরা। কিন্তু সরকার তাঁদের স্বীকৃতি দেয়নি। উলটে ১৯৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারি ওই উদ্বাস্তুদের উৎখাত করতে পুলিশ পাঠায় রাজ্য সরকার। সেদিন ৩০ থেকে ৩৫টি লঞ্চ নিয়ে পুলিশ পুরো দ্বীপটিকে ঘিরে ফেলে। তারপর ২৪ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলে নরসংহার। মৃতের সঠিক সংখ্যার আজও কোনও পরিসংখ্যান নেই।

১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই। ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহাকরণ অভিযান করেন যুব কংগ্রেস কর্মীরা। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে থেকে আসা বহু যুব কংগ্রেস কর্মী কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে জড়ো হন। মমতার নেতৃত্বে হাজার হাজার যুব কংগ্রেস কর্মী ব্রেবোর্ন রোড ধরে মহাকরণের উদ্দেশে অভিযান শুরু করে। যুব কংগ্রেস কর্মীদের সেই মিছিলে নির্বিচারে গুলি চালায় পুলিশ। মোট ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী প্রাণ হারান। আহত হন শতাধিক। সেই শুরু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান। ক্ষমতায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্ত কমিশন করেন। কিন্তু কমিশনের রিপোর্ট তথৈবচ।

শুধু বগটুই নয়। লালমাটির দেশ বীরভূমের মাটি বহুবার রাজনৈতিক হিংসায় রক্তে লাল হয়েছে। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া নানুর ব্লক। যেখানে মূলত ভূমিহীন, জনজাতি, মুসলমানদের বাস। সেই নানুর শিরোনামে আসে ২০০০ সালের গণহত্যার পর। নানুরের সূচপুরে একটি বিতর্কিত জমিতে চাষ করা নিয়ে ভূমিহীন-রোজগারহীন কৃষকদের উপর নির্বিচারে হামলার অভিযোগ ওঠে সিপিএম সমর্থকদের বিরুদ্ধে। মোট ১১ জনের মৃত্যু হয়। প্রত্যেকেই ছিলেন তৃণমূল সমর্থক।

প্রায় ২১ বছর আগে গড়বেতার এক অখ্যাত গ্রাম ছোটো আঙারিয়ার নাম উঠে এসেছিল সংবাদ শিরোনামে। আবারও এক গণহত্যার জন্য। জঙ্গলমহলে তখন সদ্য সংগঠন গড়ে তুলছে তৃণমূল। মাওবাদীদের প্রভাব বাড়ছে। ২০০১ সালের ৮ জানুয়ারি গড়বেতার ছোটো আঙারিয়া গ্রামে বক্তার মণ্ডল নামের এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে মাওবাদীদের সঙ্গে গোপনে বৈঠকে বসে তৃণমূল-সহ কয়েকটি বিরোধী দলের কর্মীরা। অভিযোগ, খবর পেয়ে সেই বাড়িতে চড়াও হয় সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। চলে দু'পক্ষের গুলির লড়াই। ১১ জন তৃণমূলকর্মীকে গুলি মেরে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। পরে সেইসব তৃণমূলকর্মীদের কঙ্কাল উদ্ধার হয়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম উত্থান ক্ষেত্র নন্দীগ্রাম। ২০০৭ সালের কেমিক্যাল হাবের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে নন্দীগ্রাম। তৎকালীন বাম সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একযোগে প্রতিরোধ গড়ে তোলে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি, তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজ্যের সুশীল সমাজ। ২০০৭ সালে দুটি গণহত্যা হয়েছিল নন্দীগ্রামে। প্রথমে ১৪ মার্চ ভূমি উচ্ছেদ কমিটির 'মুক্তাঞ্চল' দখলের সময় পুলিশি অভিযানে। যাতে পুলিশের পোশাকে সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালায়। মারা যান ১৪ জন। বহু মানুষ আহত হন। বহু ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। দ্বিতীয় গণহত্যাটি হয় ১০ নভেম্বর। সেই ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিরই মিছিলে গুলি

চালায় দুষ্কৃতীরা। এবারে প্রাণ যায় ১০ জনের।

৭ জানুয়ারি ২০১১। অর্থাৎ রাজ্যে পালাবদলের ঠিক আগে আগে ঝাড়গ্রামের নেতাইয়ের এক সিপিএম নেতা মাওবাদী প্রতিরোধের নামে নিজের বাড়িতেই দুষ্কৃতীদের নিয়ে সশস্ত্র শিবির বসিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা এবং বিরোধীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা। কিন্তু সেই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হন স্থানীয়রাই। তারপরই ওই সিপিএম নেতার নির্দেশে নির্বিচারে সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। প্রাণ হারিয়েছিলেন ৯ জন নিরীহ গ্রামবাসী। নেতাইয়ের এই ঘটনাই রাজ্যে বাম শাসনের সমাপ্তির বার্তা বয়ে এনেছিল বলে মনে করেন রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা।

আর এখন, বীরভূমের রামপুরহাটের 'বগটুই' কাণ্ড নিয়ে উত্তাল গোটা রাজ্য। রামপুরহাট-১ নম্বর ব্লকের বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান তথা তৃণমূল নেতা ভাদু শেখ চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেওয়ার সময় খুন হন।

ভাদু শেখ তার বন্ধুদের সঙ্গে ১৪নং জাতীয় সড়কের ধারের একটি চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। চা খাবার পরপরই তাকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা বোমা ছোঁড়ে। তৎক্ষণাৎ তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। এদিকে ওইটুকু সময়ের মধ্যে ওই এলাকায় দশটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ির ভেতরে যারা ছিলেন তারা জীবন্ত জ্বলতে শুরু করে। আগুনে ঝলসে আস্ত মানুষগুলো তখন দলা পাকানো মাংসপিণ্ড। বাদ যায়নি শিশু, মহিলারাও।

দমকল, পুলিশ, আমলা— নবান্নের নির্দেশে তোতলাচ্ছেন সবাই। ঢোঁক গিলছেন। ব্যুরোক্রেসির ফর্মাল ন্যারেটিভে সত্য গোপন করছেন সব্বাই! মৃতের সংখ্যা, আহতের সংখ্যা, ক্ষয় ক্ষতির ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফিগারস— গুলিয়ে দিচ্ছেন সব্বাই। বর্বরতার সাক্ষী লাশগুলো দেখে ফরেনসিক টিম বলতে পারছে না, কে পুরুষ, কে মহিলা। অথচ, জেলার রিং-মাস্টার তদন্তের আগেই বলে দিচ্ছেন 'টিভি থেকে শর্ট সার্কিট'! চিটফান্ডে গরিবের টাকা চুরির আসামি বলে দিচ্ছেন 'বৃহত্তর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র'। অথচ সকলেই বোঝেন, তৃণমূলের গ্যাং-ওয়ারে ঝলসে গেছে রাজনীতির রং না মাখা শিশুও। পুড়ে ছাই ৮-১০টা বাড়ি। প্রাণ হাতে গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছেন সাধারণ মানুষ! স্থানীয়রা বলছেন, পুলিশের নাকের ডগায় ঘটেছে গণহত্যা। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, 'পুলিশ তো আসলে পার্টনার ইন ক্রাইম!'

ফলে, সাসপেন্ড করা হয়েছে এসডিপিও, আইসিকে। প্রথমে আইসি ত্রিদিব প্রামাণিককে সাসপেন্ড করা হয়। তারপরই সাসপেন্ড করা হয় রামপুরহাটের এসডিপিও সায়ন আহমেদকে।

অথচ, মূল অভিযোগের আঙুল তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আনারুল হোসেনের দিকে। আসলে 'ট্রু ক্রাইম থ্রিলার'-এর থেকেও সত্য, গত অন্তত ৩০ বছর ধরে আনারুলরাই আমাদের প্রকৃত শাসক। আজ সশস্ত্র আনারুলরা চোর-পুলিশ খেলায় দুটি ভূমিকায় একই সঙ্গে অভিনয় করে প্রকৃত শাসক হয়ে উঠেছে। চমকে ওঠার কিছু নেই। মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই বগটুই-র বাসিন্দারা বলেছেন, আনারুল পুলিশকে প্রকাশ্যে নির্দেশ দিয়েছে এরা পুড়ে মরুক, তার পর যাবি। মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে এলেন, —সে কেন পুলিশ পাঠায়নি। অর্থাৎ, সেই আসল শাসক। আবার, যারা খুন হয়েছে, তারাও ধোয়া তুলসী পাতা কিছু নন, পঞ্চায়েতে গরিব মানুষের প্রাপ্য লুট করে, বেআইনি খাদান চালিয়ে যে নাফা তার ভাগ না পেয়ে প্রাসাদোপম বাড়ি করা আর এক নাটের গুরু ভাদু শেখকে খুন করেছে তারাই। তাই তো তাদের পরিবার-সহ পুড়ে মরতে হয়েছে। এর বিচার প্রয়োজন ঠিকই। তবে তারা জনগণের টাকায় সরকারি চাকরি, ক্ষতিপূরণ এসব পাবে কেন? পাবে এজন্যই, এই বেআইনি ভাগ না পাওয়ারা হিন্দু হলে বিজেপিতে এবং নিশ্চিত করেই মুসলমান হলে সিপিএমে চলে যাবে, আবার 'মমতাবাদী' থেকে 'মার্কসবাদী' হয়ে যাবে। সেলিমকে রাজ্য সম্পাদক করার বড়ো কারণও তাই। এই বেআইনি লুঠের ভাগ না পাওয়াদের লাল জামা পরিয়ে ঘরে তোলা।

আপাতত রাজ্য জুড়ে বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের কাছে সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত লোকলজ্জার চাপে রামপুরহাটের ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আনারুল হোসেনকে তাঁর নির্দেশে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু আনারুল কী এমন নেতা, তাকে স্থানীয় পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিতে হয়?

যাকে ঘিরে এত কাণ্ড সেই ভাদু শেখের বাড়িটা দেখে অনেকেরই চক্ষু চড়কগাছ। ভাদু শেখ থানার গাড়ি চালাত। ৫ বছরে রকেটের মতো উত্থান। নির্বাচনে জিতে নয়, মানি আর মাস্‌ল পাওয়ারে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ভাদু শেখ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য; পরে উপপ্রধান। বেআইনি জমিতে অট্টালিকার মতো বাড়ি! ন্যাশনাল হাইওয়ে-৬০ থেকে কিলোমিটার দুই ভিতরে বিরোধী শূন্য বগটুই গ্রাম। গ্রামের বুক চিরে রাস্তা। একদিকে উপপ্রধান ভাদুর বিলাসবহুল প্রাসাদ। অন্যদিকে, গোটা কুড়ি-পঁচিশেক ঝুপড়ির মতো খড়ের ঘর। তফাতটা চক অ্যান্ড চিজের মতো। ভাদু শেখের খুনের বদলা নিতে বেছে বেছে আগুন লাগানো হয়েছে দশটি বাড়িতে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় মন্ত্রী, হেলিকপ্টারে চেপে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে ভাদু শেখের বাড়ি গেছেন। পুড়ে যাওয়া খড়ের ঘরে

যাননি। আর ক্যামেরার সামনে ভাদু শেখের স্ত্রী বিহ্বল হয়ে বলেছেন, 'আমার স্বামী একা খেত না। সবাইকে দিয়ে খেত। তবু সহ্য হলো না।'

হুবহু 'গ্যাংস অব ওয়াসিপুর'। প্রতিদিন ডার্ক থ্রিলারের চিত্রনাট্য লেখা হচ্ছে বাংলা ভাষায়। তৃণমূল সরকারের আমলে পরপর গণহত্যা না হলেও এক মাসে রাজনৈতিক কারণে খুন ২৬টা। তিন জন জনপ্রতিনিধি। কারা খুন করল আনিসকে? কাদের গ্যাংওয়ারে খুন হতে হলো পানিহাটির তৃণমূল কাউন্সিলরকে? কারা তুহিনা আর তার দুই দিদিকে ধর্ষণ করে খুনের হুমকি দিল? দেওয়ালে ঝুলন্ত লাশের ছবি আঁকল? কাদের ভয়ে ১৯ বছরের তুহিনা আত্মহত্যা করল? কাদের মদতে ঝালদার ওসি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিতে চাপ দিল নির্বাচিত কাউন্সিলার তপন কান্দুকে? কাদের হাতে খুন হতে হলো তপন কান্দুকে? কারা লাথি মারে দেউচা পাঁচামির প্রতিবাদী জনজাতি অন্তঃসত্ত্বার মায়ের পেটে? কাদের মদতে সেদিন মরতে হয়েছিল সুমনা মান্ডি, ঝরনা মান্ডিদের? কারা জ্যান্ত পুড়িয়ে দিয়েছিল ঊষারানি দাস, দেবু দাসদের? কাদের মদতে সেদিন মাওবাদীরা মারতে এসেছিল মার্শাল মুর্মুর শিক্ষককে?

নির্বাচনের আগে শাসকের স্লোগান, 'খেলা হবে' কী জিনিস বোঝাই যাচ্ছে। এই খেলা পশ্চিমবঙ্গের আমজনতা চেয়েছিলেন কি? না, চননি? হলফ করে বলতে পারি রাজ্যের নব্বই শতাংশ মানুষই চাননি? এই খেলার জন্য মাতব্বর কচি নেতারা ডিজে লাগিয়ে পাড়ার মোড়ে নাচ করেনি? দক্ষিণ কলকতার পশ মলে ক্যান্ডেল লাইট ডিনার সেরে, হালকা করে স্কচ চাপিয়ে ইউক্রেনে মানবতার তত্ত্ব কপচাননি? এরজন্য, পরিবর্তন চেয়ে বুদ্ধিজীবীরা রাস্তায় নেমে মিছিল করেননি? জনপ্রিয় নায়িকা সানগ্লাস পরে, মিনারেল ওয়াটারের বোতল হাতে লালগড় দৌড়াননি? এই খেলার জন্য নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরে আপাদমস্তক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত রচিত হয়নি? কিষানজীরা মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী দেখতে চাননি? এই খেলার জন্য সংবাদমাধ্যম একযোগে তাঁকে দিনের পর দিন বিজেপির বিরুদ্ধে 'মসিহা' বানায়নি? সাংবাদিকতার এই নির্লজ্জতা 'রাজনীতির মাস্টারস্ট্রোক' বলে নিয়মিত আপনার ড্রইংরুমে সার্ভ করা হয়নি? রাজনীতিকে স্রেফ একটা 'খেলা' হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার আফটার এফেক্টটা বোঝাই যাচ্ছে। 'চড়াম-চড়াম ঢাক' বাজানো, দরজার বাইরে 'উন্নয়ন'কে দাঁড় করানো, ভোটারদের 'গুড় বাতাসা' খাওয়ানো, 'শুটিয়ে লাল' করে দেওয়ানোর সস্তা চার-আনার মিম মেটেরিয়ালের ডায়লগ বাজির গ্রাউন্ড রিয়েলিটিটা বুঝেছেন এখন সবাই। একটা গোটা গণহত্যা, 'টেলিভিশন থেকে শর্ট সার্কিট'। বাহ্!

নিশ্চিত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে বেকার যুবসমাজ। যাদের নিয়ন্ত্রণ করছে পাড়ার ক্লাবে দাদাগিরিতে অভ্যস্ত সিন্ডিকেট মাফিয়ারা। সরকারের ঘরে টাকা নেই। রাজ্যে চাকরি নেই, বিনিয়োগ নেই, গণতন্ত্র নেই, ল' অ্যান্ড অর্ডারের ছিটেফোঁটা নেই, নিজের ভোট নিজে দেওয়ার অধিকার নেই। 'খেলা হবে'র নামে রাজ্য রাজনীতির স্টিয়ারিঙে লুম্পেন একটা 'শ্রেণী'। ভোট লুঠ, সিন্ডিকেট, কাটমানির নেতৃত্বে সিভিক পুলিশ! যাদের যোগ্যতা উর্দি পরে শাসকের হয়ে হাফ-কোয়ার্টার-ফুল মস্তানি করা। 'সততা' 'রাজনৈতিক আদর্শ', 'মূল্যবোধ'— সব ক্লিশে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি পর্যবসিত হচ্ছে লাভ-লোকসানের অঙ্কে! পর্যবসিত হচ্ছে 'করে খাওয়ার' রসায়নে! খেলা হচ্ছে আগুন নিয়ে। খেলা হচ্ছে রুটি-রুজি নিয়ে। খেলা হচ্ছে বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ নিয়ে।

যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'হিন্দু খতরে মে হ্যায়'— তাই বিজেপিকে ভোট দিন! তার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মুসলমানরা দুধেল গোরু, লাথি খেতে হবে!' সত্যি রাজনীতির ভাষ্যে দু'জনকে আলাদা করতে পারা যায়? পার্থক্য একটাই, ব্রাহ্মণ কন্যার মুখে একথা মানায় না।

তৃণমূলের বাবুল আর বিজেপির বাবুলকে আলাদা করা যায়? যারা প্রতিদিন দেশের সর্বনাশ করছেন তারা রাজ্যের ভালো করবেন। আর যিনি প্রতিদিন রাজ্যের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন, তিনি দেশের ভালো করবেন। মিডিয়ার তৈরি এই ফেয়ারিটেলে ভরসা করতে পারেন কেউ? তুহিনা খাতুন, ঝরনা মান্ডি, তপন কান্দুর লাশ দেখে— কে মুসলমান, কে হিন্দু, কে জনজাতি হিসেব কষা যায়? ঊষারানি দাস, দেবু দাস, ভাদু শেখের রক্তের রং দেখে কে সিপিএম, কে তৃণমূল চিনতে পারেন? খবরের পর্দায় রক্তাক্ত মৃতদেহগুলো দেখে বুকটা যখন মুচড়ে ওঠে তখন একটি কথাই মনে হয়, 'এরা মানুষ'!

সরকারের গৃহপালিত মিডিয়া মানুষকে বাঁচাবে না! দালাল বুদ্ধিজীবীরা আপনার হয়ে লড়বে না! বগটুই কাণ্ডের পর নেটিজেন মহলে প্রশ্ন উঠেছে, নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় যে বুদ্ধিজীবীরা রাস্তায় নেমেছিলেন তারা এখন কোথায়? তাই, এটা জেনে রাখা ভালো পৃথিবীর ইতিহাসে কোনওদিন ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে তাঁবেদার মিডিয়া কিংবা সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীরা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ায়নি। বিশ্বাস করুন, ২০১১ থেকে ২১; বামফ্রন্টের নির্বাচনী পরাজয় কোনও সিম্পল লিনিয়ার ইকুয়েশন ছিল না! দেশের সমস্ত শক্তির রামধনু জোটের মুখ হিসেবে প্রজেক্টেড হয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ফিনান্স ক্যাপিটালের ব্লু-আইড কন্যা মমতা! ২০১১-তে মিডিয়ার ফুটেজ না থাকলে সেদিনও এই মমতা ছিলেন বিগ জিরো। পুলিশ-সিভিক না থাকলেও আজকের তৃণমূলও বিগ জিরো। কংগ্রেস নেই। এই রাজ্যের বিধানসভা বামশূন্য। এখন অপশন দুটো। চয়েস একটাই। ফুল বদলানো। □

প্রকৃতির সঙ্গে থাকতে হলে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলতে হয়

তপন কুমার বৈদ্য

১৯৪৮ সালে ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন (WHO)-এর স্থাপনা হয়। প্রতিষ্ঠার ঠিক দুই বছর পর অর্থাৎ ১৯৫০ সাল থেকে ৭ এপ্রিলকে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে পালন করা শুরু হয়। ২০২২ সালেও ৭ এপ্রিল এই বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পুরানো বছরের ন্যায় একটি বিশেষ বিষয় বা Theme-কে লক্ষ্য রেখে পালন করা হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন এবারের বিষয় রেখেছে— Our Planet, our health. উদ্দেশ্য, Well being Societies and healthy Societies। অর্থাৎ 'এই পৃথিবী নামক গ্রহই আমাদের স্বাস্থ্যের মূল'— একে ভালো রাখতে পারলে আমাদের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। সুন্দর ব্যবস্থিত সমাজ থাকলে আমরা স্বাস্থ্যকর সমাজ পাবো।

আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন যে চিন্তার উপর বিশ্বাস করে এই বিষয় রেখেছে— আমাদের হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যেই এই বিশ্বাস হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের মাধ্যমে মুনি-ঋষিরা তাঁদের কঠিন তপস্যার দ্বারা অর্জিত এই জ্ঞান আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং ইংরেজি শিক্ষার মোহজালে তা আমরা অনেকাংশ ভুলতে বাধ্য হয়েছি। আজ আবার বিভিন্ন সংগঠনের প্রভাবে জানার চেষ্টা করছি। তবে অনেকাংশ ভুলে গেলেও সম্পূর্ণ ভুলতে পারিনি। সেটা বিগত কোভিড-১৯, মহামারি কালখণ্ডে অনুভব করতে পেরেছি। বিশ্বের উন্নত দেশগুলির চিকিৎসা বিজ্ঞানের গর্ব চূর্ণ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক বিনা চিকিৎসায় জীবন হারিয়েছেন। তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ ভারতবর্ষ করোনা কালখণ্ডে এই বিশাল জনসংখ্যার মধ্যেও এই দৃষ্টান্ত রেখেছে এবং মানুষের জীবনহানির হারও উন্নত পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় অনেক কম হয়েছে।

ভারতবর্ষের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী যাঁরা নিজেদের ভারতমাতার সন্তান বলতে গর্ববোধ করেন, তাঁরা পরম্পরার মাধ্যমে জেনে এসেছে যে, প্রকৃতি ঈশ্বরের রূপ। শাস্ত্র থেকে জানতে পারছি— এই জগতে যা কিছু আছে— তা সে জড় হোক আর চেতন হোক, সবেতেই ঈশ্বর বিরাজ করছেন। সেই জন্য হিন্দুরা জগতের যা কিছু আছে সবার মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজে পান এবং পূজা করতে শুরু করেন। সে পাথর হোক, উদ্ভিদ হোক, জীব হোক, ভূমি হোক, আকাশ, বাতাস, পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা, বরফ, অগ্নি— যা

কিছু আছে কিংবা কল্পনা করা যায়, সকলের সুস্থতা ও মঙ্গল কামনা করে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় শিক্ষিত দেশি-বিদেশি জ্ঞানীরা তা নিয়ে আমাদের ঠাট্টা-তামাশা করতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। তাতেই আমরা একটু সাময়িক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। আজ তাদের পক্ষ থেকেই আবেদন রাখা হচ্ছে 'পৃথিবীকে ভালো রাখলে আমরা ভালো থাকবো।' দেরিতে হলেও শুভ বুদ্ধির উদয় হলে মন্দ কী? তবে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রনায়কদের যে ব্যবহার আমরা দেখতে পেয়েছি তাতে মনে একটা প্রশ্ন জাগছে, এভাবে কি পৃথিবীকে ভালো রাখা যাবে? এতে কি জড় ও চেতন কেউই ভালো থাকবে? যেখানে রাসায়নিক, আণবিক জৈবিক ইত্যাদি মারণ অস্ত্র অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ব্যবহার করছি সেখানে প্লাসটিক ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টার কোনো অর্থ হয় কি? যাই হোক, এটা জ্ঞানীদের বিষয়, আমার মতো সাধারণ ব্যক্তির বিষয় নয় এবং আয়ত্তেও নয়।

তবে এটা বলতে পারি। ঘটা করে বছরে একদিন বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন করা যেতেই পারে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য ৩৬৫ দিন নিজের নিরন্তর চেষ্টা করার প্রয়োজন আছে। কেননা— স্বাস্থ্য তো আর বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না, ফ্লিপকার্ট কিংবা অ্যামাজনে অন-লাইনে অর্ডারও করা যায় না। জীবনশৈলীর মাধ্যমে নিজেকেই অর্জন করতে হয়। তার জন্য বর্তমান জীবনশৈলীর কিছু পরিবর্তনের দরকার। কেননা, আমাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে সুস্থ থাকতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং রাষ্ট্রীয় ভাবেও সুস্থ থাকতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে থাকতে হবে। প্রকৃতি থেকে দূরে অর্থাৎ সুস্থতার থেকেও দূরে এটা মনে রাখতে হবে।

প্রকৃতির সঙ্গে থাকতে হলে প্রকৃতির কিছু নিয়ম মেনে চলা দরকার। যথা : **আহার :** কী খাবো, কেন খাবো, কখন খাবো, কতটা খাবো, বিরুদ্ধ আহার কী; মিতভুক, হৃতভুক, ঋতুভুক, জাঙ্কফুড, আর্টিফিসিয়াল ফুড, প্যাকেজ ফুড ইত্যাদি বিষয়ে ভেবে আহার করা।

বিহার : পরিবেশ স্বচ্ছতা, ব্যায়াম, যোগাসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি সম্বন্ধে ভাবা।

আচার : প্রভাতে জাগা, পরিমাণ মতো জল পান এবং ভোজন করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা।

বিচার : কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য ইত্যাদি রিপু বশে রাখা। অপরকে ক্ষমা করা, অন্যের ত্রুটি না দেখা ইত্যাদি।

ব্যবহার : পরিবার, সমাজ, আত্মীয়, সহযাত্রী, সহকর্মী সকলের সঙ্গে যথাযথ উপযুক্ত ব্যবহার করা। সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা, অত্যাধুনিক সুবিধা যেমন মোবাইল ইত্যাদি ব্যবহারিক রূপে ব্যবহার করা ইত্যাদি। সাধারণত এভাবে চলতে পারলে কিছুটা হলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে মনে হয়।

অনাদায়ী ঋণের বোঝা কমাতে ‘ব্যাড ব্যাংক’ গঠনের সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী

সম্পদ পুনর্গঠন সংস্থা পূর্বনির্ধারিত দরে ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে অনুৎপাদক ঋণ ক্রয় করে তার উপযুক্ত সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনাদায়ী ঋণ আদায়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে। এর ফলে ব্যাংকগুলি অনুৎপাদক ঋণের ভারমুক্ত হয়ে স্বাভাবিক ব্যাংক ব্যবসায় মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবে।

আনন্দ মোহন দাস

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় ভারতবর্ষের বেশিরভাগ ব্যাংক বিশেষভাবে সরকারি ব্যাংকগুলি অনাদায়ী ঋণের ভারে জর্জরিত এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় কংগ্রেসি আমলে যে সমস্ত বৃহৎ ঋণ প্রদান করা হয়েছে, তার বেশিরভাগই আজ অনুৎপাদক ঋণ (এনপিএ) হিসাবে পর্যবসিত। সে নীরব মোদী হোক, মেহুল চোকসী হোক বা বিজয় মাল্য হোক সকলেরই লোন কংগ্রেসি আমলে মোটা অঙ্কের উৎকোচের বিনিময়ে প্রদান করা হয়েছিল বলেই অভিযোগ।

তথ্যসূত্রে জানা যায় ২০২১ সালের মার্চ মাসের হিসেব অনুযায়ী ব্যাংকশিল্পে সর্বমোট অনাদায়ী তথা অনুৎপাদক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮,৩৫,০০০ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অনুৎপাদক ঋণের (এনপিএ) বোঝা নিয়ে ব্যাংকগুলি আজ ব্যতিব্যস্ত। তার ফলে ব্যাংকগুলি তাদের সাধারণ পরিষেবা ছেড়ে এই অনুৎপাদক ঋণ আদায়ে বা তার সমাধানে অত্যধিক মনোনিবেশ করতে বাধ্য হচ্ছে। এবং রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী অর্থ অনাদায়ী ঋণের জন্য প্রভিশন করতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে পুঁজির টান পড়ায় ব্যাংকগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে। সাধারণভাবে ব্যাংকগুলি মূল ব্যবসা ছেড়ে এনপিএ সামলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, মা-বাপের বেকার সন্তানের মতো অনুৎপাদক ঋণের মাধ্যমে ব্যাংকের সুদবাবদ কোনোরকম আয় হয় না। এটি ঘটনা। ব্যাংকগুলি লোনের সুদের আয় থেকেই তাদের পরিচালন খরচ ও জমার উপর সুদ প্রদান করে থাকে। এমতাবস্থায় ব্যাংকগুলির অত্যধিক অনুৎপাদক ঋণের পরিমাণ সুষ্ঠ পরিচালনায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং একে অশনি সংকেত বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। পুঁজি সংকট থেকে মুক্ত হতে জনগণের করের টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতিনিয়ত মূলধন হিসেবে ব্যাংকগুলিকে সরবরাহ করতে হয় যা সুস্থ ব্যাংক ব্যবস্থার পরিপন্থী বলেই মনে করা হয়।

সুতরাং আর্থিক মেরুদণ্ড হিসেবে ব্যাংকশিল্পকে রক্ষা করতে ও সুষ্ঠ ব্যবস্থার মাধ্যমে অনাদায়ী তথা অনুৎপাদক ঋণের সমাধানকল্পে একটি পৃথক ব্যবস্থার আশু প্রয়োজনে ‘ব্যাড ব্যাঙ্ক’ গঠন একটি সময়োপযোগী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এখানে উল্লেখযোগ্য ১৯৮৮ সালে সর্বপ্রথম ব্যাড ব্যাঙ্কের ধারণার জন্ম হয়েছিল আমেরিকায়। বিশ্বে প্রথম ব্যাড ব্যাঙ্কের নাম ‘ইউএস ব্যাসেল মিলন ব্যাঙ্ক’। পরবর্তীকালে আমেরিকা ছাড়া ফিনল্যান্ড, সুইডেন, ইন্দোনেশিয়া, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে এই ধরনের ব্যাঙ্কের সূচনা হয়।

বিলম্বে হলেও ব্যাংকশিল্পকে বাঁচাতে অনাদায়ী ঋণের সুষ্ঠ সমাধানের উদ্দেশ্যে গত ২০২১-২২ সালের আর্থিক বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ব্যাড ব্যাংক গঠনের প্রস্তাব করেন। ভারতে ব্যাড ব্যাংকের অর্থ হলো একটি জাতীয় সম্পদ পুনর্গঠন সংস্থার (National Assets Recontruction Company Ltd.) গঠন, যার মাধ্যমে ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক ঋণ বা সম্পদের (এনপিএ) অ্যাকাউন্টগুলিকে স্থানান্তর করে ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শিটগুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখতে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। এই পরিকল্পনায় সম্পদ পুনর্গঠন সংস্থা ব্যাংকগুলিকে ১৫ শতাংশ টাকা নগদে প্রদান করে এবং বাকি ৮৫ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার গ্যারান্টি প্রদান করে।

বাজেট ঘোষণা অনুযায়ী অনাদায়ী ঋণ সংক্রান্ত ব্যাপারে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ স্টেট ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার পদ্মকুমার মাধবন নায়ারকে চেয়ারম্যান করে এই ব্যাড ব্যাংক ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ব্যাংকশিল্পের দু’ লক্ষ কোটি টাকার অনুৎপাদক ঋণকে ব্যাড ব্যাঙ্কে (এনএআরসিএল) স্থানান্তর করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে এবং সরকারি গ্যারান্টি বাবদ ৩০৬০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই ক্যাবিনেট অনুমোদন করেছে।

সম্পদ পুনর্গঠন সংস্থা পূর্বনির্ধারিত দরে ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে অনুৎপাদক ঋণ ক্রয় করে তার উপযুক্ত সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনাদায়ী ঋণ আদায়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে। এর ফলে ব্যাংকগুলি অনুৎপাদক ঋণের ভারমুক্ত হয়ে স্বাভাবিক ব্যাংক ব্যবসায় মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবে এবং তাদের আর্থিক স্বাস্থ্য ফিরবে।

‘সম্পাদকীয়’ তথ্যনিষ্ঠ নহে

২৯ নভেম্বর ২০২১-এ প্রকাশিত স্বস্তিকার সম্পাদকীয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষেপে কিছু কথা।

১. গুপ্তযুগের অন্তে নয়; গোপালকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়েছিল রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর (৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ) পর। ষষ্ঠ শতাব্দের শেষভাগে, শশাঙ্ক মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন। মৌখরি এবং পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজগণের মধ্যে বংশানুক্রমিক বিবাদ চলছিল। অর্ধশতাব্দীব্যাপী এই সংঘর্ষের ফলে এবং উত্তর হতে তিব্বতীয়দের এবং দক্ষিণ হতে চালুক্যদের আক্রমণে গুপ্তরাজগণ হীনবল হয়ে পড়েন; এবং এই সুযোগে গৌড়দেশে শশাঙ্ক এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা শশাঙ্কের দেহাবসানের পর গৌড়রাজ্য অভ্যন্তরীণ কলহ ও বিদ্রোহে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়; দেশে একাধিক রাজার অভ্যুদয় হয়। ফলে দেশে যে মাৎস্যন্যায় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সেই নৈরাজ্য থেকে উদ্ধারলাভের প্রয়োজনে বাঙ্গলার বিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিগণ সমরাভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশাসক গোপালকে বাঙ্গলার রাজপদে নির্বাচিত করেছিলেন। সেই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষদের কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না।

২. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দ রাজপ্রাসাদের কোনো দাসীর পুত্র ছিলেন না। চন্দ্রগুপ্তের পিতা ‘মোরিয়া’ জনজাতি গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন। এক সীমান্ত সংঘর্ষে তাঁর মৃত্যু হলে নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁর স্ত্রী বহুদূরবর্তী পাটলিপুত্রের এক গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। চাণক্য একদিন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় গ্রামের ছেলেদের খেলাধুলায় রাজার ভূমিকায় একটি বালকের অনায়াস প্রভুত্বব্যঞ্জক অভিনয় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই বালকটি ছিল উপরোক্ত মোরিয়া-প্রধানের পুত্র। নিজের সংকল্পসিদ্ধির উদ্দেশ্যে চাণক্য বালকটিকে তক্ষশিলায় নিয়ে যান এবং তাকে নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। রাজা ধননন্দের রাজসভায় একসময় অপমানিত হয়ে চাণক্য সেই সভায় দাঁড়িয়ে শপথ করে বলেছিলেন, নন্দরাজবংশ ধ্বংস না করা পর্যন্ত তিনি ‘শিখাবন্ধন’ করবেন না। চন্দ্রগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে নন্দরাজকে রাজ্যচ্যুত করে চাণক্য সেই শপথ পূরণ করেছিলেন; ধননন্দের স্বৈরাচার থেকে দেশের ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষদের কথা ভেবে নয়।

৩. বলা হয়েছে, দেশের সংবিধান রচনার প্রাথমিক শর্ত, যেটিকে দেশীয় সংস্কৃতি এবং লোকাচারের দর্পণ হতে হবে। ভারতের সংবিধানে কোথায় সেই শর্তের ব্যত্যয় ঘটেছে, সে সবের কিছু নমুনা প্রত্যাশিত ছিল।

পরিশেষে আর একটি কথা। ভারতের সুপ্রাচীন গণতন্ত্রের ‘প্রকৃষ্ট উদাহরণ’ ষোড়শ (মহা) জনপদগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। শক্তিশালী কাশী ও কোশল রাজ্যদুটির মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ বাধত। স্বশাসিত শাক্য জনগোষ্ঠী কোশলের আংশিক নিয়ন্ত্রণ মেনে নিলেও কোশলের রাজা বিদুদভ তাদের রাজ্য আক্রমণ করে শিশু, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে শাক্যদের হত্যা করেছিলেন।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

রাজনীতির গতকাল ও বর্তমান

এখানে গতকাল মানে পুরানো। বর্তমান তো বর্তমানই। আমরা যারা ৬০-এর দশকে বা তার পরে রাজনীতি শুরু করেছি, তারা কিন্তু নীতি-আদর্শকে আঁকড়ে ধরেই রাজনীতি করেছি। তাই সেই নীতি- আদর্শ সমাজে মানুষের ভোটের বাক্সে কতখানি প্রভাব আছে বা পড়তে পারে তার খোঁজ খবর নিতাম না। আমাদের আদর্শ সঠিক, তাই তার সমর্থনে গলা ফাটাতাম। আলোচনা সভায়, বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণ করতাম। যে বক্তব্য আমরা রাখতাম তা শুনে লোকজন বলতো,‘ভাই ভালো কথা, তবে যৌবন হারিয়ে বয়স্ক মানুষের দলে নাম লিখিয়েছি। আমাদের মতের বিরোধীরা তো কোনোদিন দমাতে পারেনি। কিন্তু আজ নীতিহীন রাজনৈতিক মানুষদের দেখে মনের শক্তি হারিয়ে ফেলছি।’ এই বর্তমান রাজনীতি? আমরা কি বোকা ছিলাম? ঘরের টাকা দিয়ে রাজনীতি করেছি। ঘরে খাবার আটা দিয়ে পোস্টার মেরেছি। ঘরের টাকা খরচ করার জন্য বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে জুটতো বকুনি ও মার। তবুও দমে যাইনি। ভাবতাম এটাই সঠিক কাজের ডিভিডেন্ট। তখন সব দলেরই সম্পদ ছিল আমাদের মতো বোকা ছেলে-মেয়েরাই। সেদিন রাজনীতির অবক্ষয় ছিল না। বর্তমান ঘুণ ধরা রাজনীতি হলো নীতিহীন স্বার্থসর্বস্ব রাজনীতি। মূল্যবোধ বিন্দুমাত্র নেই। থাকলে একদলের হয়ে মানুষের ভোটে জিতে সেই মানুষের ইচ্ছাকে পদদলিত করে অন্য দলে নাম লেখাতে পারতো না। দলত্যাগ বিরোধী আইন থাকা সত্ত্বেও স্পিকার সাহেব আইনকে সুন্দরভাবে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিচ্ছেন। বর্তমানে সবই সম্ভব। তাই গতকালের সৎ কর্মীদের রাজনৈতিক শোপিসে পরিণত করার প্রয়াস শুরু হয়েছে। সেদিন না দমলেও আজ আমরা সত্যিই দমে গেছি।

—**শ্যামল হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

হোলি ভালোবাসার মূর্ত রূপ

হোলি খেলা কি শুধু রঙের খেলা? মনের খেলা নয়? হোলি মনে কেন দোল দেয়। মনে দোল দেয় বলে কি দোল খেলা? হোলি মিলনের খেলা বলে প্রাণের খেলা হয়ে ওঠে। এমন দিনে যদি পুরুলিয়ার বেগুনকোদরে থাকতাম। সাঁওতাল পল্লীতে পাহাড়ের কোলে শাল, পলাশ, মহুয়া বনে। হেমন্ত সোরেনদের শান্তির সেই শান্ত কুটিরে। সকাল থেকে হোলি খেলতাম। মাদল বাজত। মহুয়া ফুলের রসে চোখে লাগত নেশা। তখন বলতাম, প্রিয়া, ফুল খেলবার দিন অদ্য। চোখে লেগেছে নীল মদ্য। চোখে মদ্য তো লাগবেই যদি সে পলাশ রাঙা হয়ে ওঠে। রাতে পলাশ ফুল জলে ভিজিয়ে রেখে দিলে হোলির দিন সকালে

সুবাসিত, রঞ্জিত জলে রোমাঞ্চিত লাগে হোলি খেলে। এমন হোলি খেলা কেউ কখনো ভোলে? ইস, আজ যদি সুমনা থাকতো! পলাশের লাল জলে হোলি খেলে তাকে রাঙিয়ে তুলতাম। তার লজ্জা ঢাকুক সুবাসিত, রঞ্জিত রঙে। আরও রাঙিয়ে উঠুক আবির মেখে। তৃপ্ত তখন তার সারা শরীর-মন। পাহাড়, ঝরনা, শাল, পলাশ, মহুয়া বনে লাগে ফাগুনের দারুণ রাগ! পাহাড়ের গুহা থেকে, ঝরনার পথ ধরে, বন থেকে বনে বনে, পাহাড়ি পথে পথে সাঁওতাল পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা হোলিতে মেতে ওঠে। প্রাণের স্পর্শে হর্ষে তারা হোলি খেলে মাদলের সুরে নেচে। তাদের চোখে তখন নীল নেশা। তাদের এমন হোলি খেলা দেখে স্বর্গের রম্ভা, উর্বশীরাও হিংসা করে। তাদের একটাই রং, মনের রং, একটাই সুর প্রাণের সুর। বিশ্বপ্রেমিক প্রেমিকার দল হয়ে ওঠে তারা। প্রেমের বাঁধনে তারা কেমনে বেঁধেছে বিশ্বকে। এমন দিনে হোলি খেলি বা না খেলি মনে দোল লাগে। হোলি এসে কখনো দোল দিয়ে যায় মনে। হোলি খেলতে এখন আর ইচ্ছা হয় না। পাহাড় রাজ্যের রাজকন্যা সুমনা আসে না তাই। কিন্তু সে যে কখন রাঙিয়ে দিয়ে যায় মনে! মনের দুয়ার খুলে পথ হয়ে ওঠে লাল, গোলাপি। মহুয়ার গন্ধে বাতাস মাতাল হয় মনের গভীরে। হোলি শুধু প্রেমের খেলা? বিরহের খেলা নয়? হোলিতে আছে শুধু মিলন। মিলন আছে বলে এতো উচ্ছ্বাস, এতো আনন্দ। এই প্রেমের খেলা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

দলের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব থাকা অনুচিত

আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে বেশিরভাগ পৌরসভার আসনগুলিতে রাজ্যের বিরোধী দল পরাজিত হয়েছে। মাত্র ৬৫টি-এর মতো পৌরসভার আসন জয়লাভ করেছে। যদিও শাসক দলের লাগামহীন সন্ত্রাস ও ভোট লুটের রাজনীতির কাছে বিরোধী দলগুলি পরাজিত হয়েছে। কিন্তু বিরোধী দল হিসেবে বিজেপির দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে যথেষ্ট সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। তাই পৌরসভা ভোটে ভরাডুবি হয়েছে। বিধানসভা ভোটের আগে যারা দলের প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় মুখ ফিরিয়ে বসেছিল, এমনকী বিধানসভা ভোটে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন। ভোটের রেজাল্টের পর এই মিরজাফরেরা কিন্তু শাসকদের কাছে মারধর, হুমকি ও খুনের শিকার হয়নি। তাই ভোটের আগের মিরজাফরেরা এখন তৃণমূল দলের সঙ্গে সেটিং করে গ্রামে ঘরে আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে। তারা চাইছে বিধানসভা ভোটে দলীয় প্রার্থীর হয়ে যে সমস্ত নেতা-কর্মী খেটেছিল তাদের বসিয়ে দেওয়া হোক। যাতে দলের সংগঠন আরও দুর্বল হয়। এ রাজ্যের জনগণ স্বাধীনতার পর প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টিকে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলের মর্যাদা দিয়েছেন। এই দলের বিরোধী দলনেতা হিসেবে শুভেন্দুবাবুর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গ্রামেগঞ্জে দলের মধ্যে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে দলীয় সংগঠন ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে ঊর্ধ্বতন সংগঠন নেতৃত্ব যদি হস্তক্ষেপ করে এই আদি ও নব্য সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় তৈরি না করে তবে এ রাজ্যের গ্রামেগঞ্জে পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে। আর তার প্রভাব আগামী লোকসভা ভোটে পড়বে। এতে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালির সমূহ ক্ষতি হবে। এমনিতেই শাসক দলের ভোট পরবর্তীতে হিংসার শিকার হয়ে বহু সক্রিয়কর্মী বসে গেছেন। তাদের একটাই ক্ষোভ, ভোটের পর এলাকার নেতৃত্বরা তাদের পাশে দাঁড়ায়নি এমনকী তাদের কোনো ক্ষতিপূরণ দলীয় ভাবে দেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে যে সমস্ত কর্মী ময়দানে থেকে রাজনীতি করতে চায় তাদের গুরুত্ব দিয়ে কমিটি তৈরি করা উচিত। বুথ স্তর থেকে সংগঠনকে ঢেলে সাজাতে হবে আর কর্মী ও নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করতে হবে। বাঙ্গলা ও বাঙ্গালিকে বাঁচাতে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আগামীদিনে শক্তিশালী হবে।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

ভারত আবার বিশ্বগুরুর পথে

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে আবারও প্রমাণিত এই নির্বাচন অহিংসতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সকলেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় নিজের অমূল্য ভোট দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, নির্বাচনের প্রচারে বিভিন্ন দলের হেভিওয়েট নেতা-নেত্রীরা উত্তরপ্রদেশে গিয়েছিলেন, তাও যোগীকে ক্ষমতা থেকে সরানো গেল না। যোগীকে আবার ক্ষমতায় আনলেন রাজ্যেরই মানুষ। সর্বোপরি অখিলেশের ডাকে সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি।

গোরক্ষপুরে মুখ্যমন্ত্রী ভাষণে বলেন, 'যোগী হলেন ভোগী, তিনি গরিবের কী উপকার করবেন। এটা চব্বিশের সেমি ফাইনাল। অখিলেশের সপা ক্ষমতায় আনুন'। আমরা সাধারণ মানুষ সকলেই লক্ষ্য করলাম ইউপি নির্বাচনে সপার জয় হলে মমতা ব্যানার্জির পিএম হবার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু সেই আশায় ছাই পড়ে গেল।'

প্রধানমন্ত্রী সবসময় গরিবের উন্নয়নের কথা বলেন, দেশের সুরক্ষা রাখার কথা বলেন। মা-বোনেদের সুরক্ষা আর সম্মানের কথা বলেন। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে শান্তি সহাবস্থানের কথা বলেন। সেনাবাহিনীকে সাহস জোগান এবং পাশে থাকার অভয় দেন। মন কি বাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তাদের নানান পজিটিভ টিপস দেন। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় কোনো জাতপাতের বিচার করেন না। এখন চলছে ইউক্রেন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ। দুই দেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলে ভারতীয় ছাত্র- ছাত্রীদের দেশে ফিরিয়ে আনলেন। অনেকেই মোদীর বিদেশ সফর নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন, আজ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিরোধীরা সেই উত্তর পেলেন। আজ বিশ্বগুরুর পথেই হাঁটছে ভারত। ইউক্রেনে আটকে পড়া বাংলাদেশ, পাকিস্তানের ছাত্র-ছাত্রীদের সেই দেশের সরকার ফিরিয়ে আনতে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। সেই ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝে গেছেন একমাত্র মোদী ভরসা, তাই ভারতের পতাকা হাতে নিয়ে বেঁচে ফিরলেন। এর থেকে বড়ো সাফল্য আর কী হতে পারে?

—রাজু সরখেল,
দিনহাটা, কোচবিহার।

দেশের আইনে রয়েছে নারী সুরক্ষা কবচ

অগ্নিদীপ্তা দে

ভারতবর্ষ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে পূর্ণ একটি দেশ। সে দেশে নারীকে দেবী লক্ষ্মীর আসনে বসানো হয়, যেখানে মাতৃশক্তির উপাসক ভারতীয়রা নারীকেই সেই শক্তির আধার মনে করেন। কিন্তু সমাজে একইসঙ্গে ফুটে ওঠে অন্য চিত্র। ক্রমশই যেন নারী সুরক্ষার অবক্ষয় ঘটছে বর্তমান সমাজে। সুরক্ষা যেন এক প্রহসন। প্রতি মিনিটে ভারতের মাটিতে মহিলা নিগ্রহের ঘটনা ঘটে।

প্রতিদিন ভারতবর্ষের কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো এক মেয়ে, এক শিশুকন্যা, এক যুবতী, এক মহিলা, এক মা জীবনে চলার পথে লাঞ্ছনা, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের শিকার। শিকারিরা ছড়িয়ে আছে সভ্য সমাজের মুখোশের আড়ালে কখনো রাস্তায়, বাসে, ট্রামে, কর্মক্ষেত্রে অথবা সবথেকে নিরাপদ আশ্রয় নিজের বাড়িতে।

নারী নির্যাতন আইনত শাস্তিমূলক অপরাধ, সেটা শারীরিক বা মানসিক দুই হতে পারে। ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানি একমাত্র শাস্তিযোগ্য অপরাধ এ ভাবনা ভুল। একটি যুবতী মেয়েকে অশ্লীল ম্যাসেজ পাঠানো বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কুমন্তব্য তাও কিন্তু শাস্তিমূলক অপরাধ, বেশিরভাগ মা-বোনেরাই সেটা জানেন না। প্রত্যেক নারীর ভারতীয় সংবিধানে মেয়েদের অধিকার এবং সুরক্ষা আইনগুলি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এখানে নারী সুরক্ষা আইনের আওতায় নারীর অধিকারগুলি দেওয়া হল।

১. আর্টিকেল ১৫ (১) : এই ধারা অনুযায়ী রাজ্যের কোনো নাগরিক লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হবে না।

২. ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট, ২০০৫, আইনটি একটি সিভিল আইন যা মূলত ফৌজদারি প্রয়োগের পরিবর্তে সুরক্ষা আদেশের জন্য তৈরি। এটি ভারতীয় আইনে প্রথমবার 'গার্হস্থ্য সহিংসতা'র বিরুদ্ধে সংজ্ঞা প্রদান করে। এই আইন মহিলাদের শুধু শারীরিক নির্যাতন নয়, মানসিক নির্যাতন থেকেও সুরক্ষা করবে।

৩. ভারতীয় সংবিধানের ২৩ (১)-এর অধীনে ব্যক্তি পাচার করা নিষিদ্ধ। ট্র্যাফিক আইন ১৯৫৬ (আইআইপিএ) হলো বাণিজ্যিক ভাবে যৌন শোষণের জন্য পাচার প্রতিরোধের জন্য প্রধান আইন, প্রতিবছর মহিলা ও শিশু পাচারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম সারির রাজ্য। এ রাজ্যে এই আইন অত্যন্ত কার্যকরী।

৪. যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা (পিওসিএসও) আইন ২০১২। এটি একটি বিশেষ আইন যার আওতায় শিশুদের ওপর হওয়া যে কোনো রকম যৌন শোষণের বিরুদ্ধে এটি কার্যকরী। বাল্যবিবাহ নিষেধ আইন ২০০৬, শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮৬ রয়েছে। আইপিসির এই নির্দিষ্ট ধারাগুলি ছাড়াও ৩৭২ ও ৩৭৩ ধারা দেহ ব্যবসায় মেয়েদের বিক্রি ও কেনার বিরুদ্ধে কার্যকরী।

৫. বর্তমান সমাজে এখনও পণপ্রথার মতো জঘন্য অপরাধ হয়ে চলেছে, তারই বিরুদ্ধে কার্যকরী পণপ্রথা নিষিদ্ধ আইন ১৯৬১। এই আইনে স্পষ্ট বলা হয়েছে বিবাহের আগে বা পরে পণ দেওয়া ও নেওয়া দুটোই শাস্তিমূলক অপরাধ।

৬. মাতৃত্ব সহায়ক আইন ১৯৬১, এই আইনের আওতায় কোনো মহিলা অন্তঃসত্তা অবস্থায় কর্মস্থানে সম্পূর্ণ সুবিধা পাবেন যদি তিনি অস্থায়ী কর্মচারী হন সেক্ষেত্রেও 'মেটারনিটি লিভ' এই আইন অনুযায়ী কার্যকরী।

৭. হিন্দু সাকসেসান অ্যামেন্ডমেন্ট আইন ২০০৫ অনুযায়ী সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকার।

৮. কর্মক্ষেত্রে যৌন নিগ্রহ নিষিদ্ধ ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, মহিলাদের যে কোনো কর্মস্থান যেমন সরকারি বা বেসকারি ক্ষেত্রে কার্যকরী।

৯. ইভটিজিং-এর শিকার মেয়েদের ক্ষেত্রেও ভারতীয় আইন ব্যবস্থায় রয়েছে বহু সমাধান। আইপিসি সেকশান ২৯৪ ধারা অনুযায়ী কোনো পুরুষ অপরাধী গণ্য হয়, যদি সে কোনো মেয়ের প্রতি কুমন্তব্য করে বা গান করে তাহলে তিন মাসের জেল হবে। আইপিসি ২৯২ ধারা অনুযায়ী কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে যদি কোনো খারাপ ছবি দেখায়, কোনো আপত্তিজনক ভিডিয়ো বা বই দেখায় তবে ২০০০ টাকা জরিমানা ও ২ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। বর্তমানে ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট আইন ২০১৩-এ ৩৫৪ ধারা অনুযায়ী এই ধরনের আপত্তিকর আচরণে কোনো ব্যক্তির তিন বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।

১০. ভারতীয় মুসলমান মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রোটেকশন অব রাইটস অন ম্যারেজ বিল ২০১৭ অনুযায়ী যে কোনো অবস্থাতেই তিন তালাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সুতরাং ভারতীয় সংবিধানে নারী সুরক্ষা আইনগুলি সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রত্যেক মেয়ের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা হওয়া উচিত। অন্যায় বা অপরাধ আড়াল না করে এগিয়ে এসে সঠিকভাবে প্রতিবাদ করে আইনের মাধ্যমে অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে। ইভটিজিঙের মতো ঘটনাকেও অবহেলা করা চলবে না। কে বলতে পারে আজকের রোডসাইড রোমিও কালকের ধর্ষক হয়ে উঠবে না। □

ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বা কৃষ্ণ ছত্রাক

সংক্রমণে মৃত্যুও হতে পারে

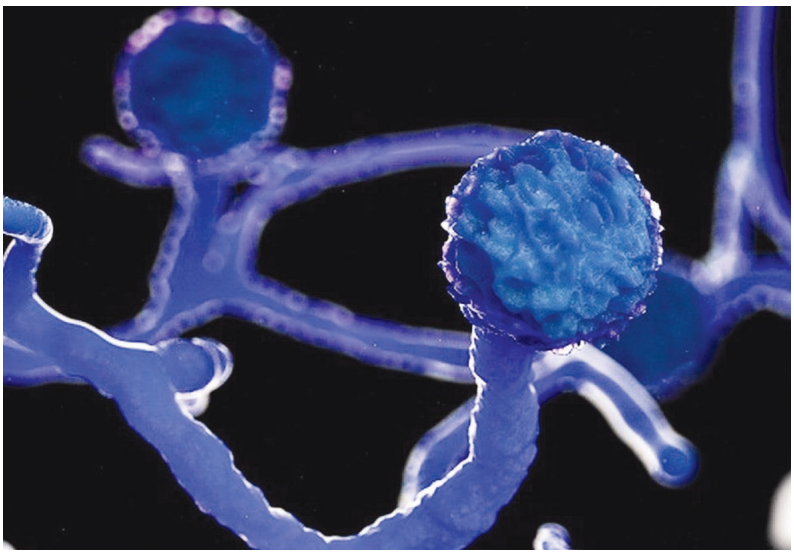

ডাঃ পার্থসারথী মল্লিক

কোভিড মহামারির সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বা কৃষ্ণ ছত্রাকও মহামারির আকার নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে এই রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

এই রোগ কী, কেমন করে হয় ও কতখানি মারাত্মক, সে সম্পর্কে আগে থেকে জানা থাকলে প্রতিরোধ করার জন্য হয়তো বা কিছু ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। তাই, সংক্ষেপে লিখছি। আমি দীর্ঘদিন ধরে ফাঙ্গাস নিয়ে কাজ করেছি। গবেষণা ও অধ্যাপনা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ও তারপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

অসুখের কারণে বা কোনো বিশেষ ওষুধ খাওয়ার ফলে যেসব রোগীর ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কমে যায়, তাদেরই এই জাতীয় ছত্রাক আক্রমণ করে বেশি। শুধু কোভিড নয় যাদের হার্ট, কিডনি জাতীয় কোনো অর্গ্যান সার্জারি বা প্রতিস্থাপন হয়েছে, এমনকী এইডস রোগীদের ক্ষেত্রেও এই জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণ দেখা যায়। কারণ একটাই। নানা ধরনের ইমিউনিটি কমিয়ে দেওয়া ওষুধ খাবার ফলে সেকেন্ডারি ইনফেকশন বা গৌণ সংক্রমণ হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। তারপর সেই 'গৌণ সংক্রমণ' মারাত্মক ক্ষতি বা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের দেশের অনেক হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে পরিচ্ছন্নতার অভাব থাকার কারণে এবং উষ্ণমণ্ডলীয় জলীয় বাষ্পবহুল দেশ হওয়ার কারণে ছত্রাক খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে। যেসব জায়গায় জল, জলীয় বাষ্প ও চারিদিক ঘেরা পরিবেশ থাকে, সেখানেই ছত্রাক বাসা বাঁধে। যেমন, পাউরুটির টুকরো বা কাটা ফল যদি রেফ্রিজারেটরের কোণে আলগা পড়ে থাকলে তাতে দু-একদিনের মধ্যেই সবুজ ছত্রাকে ভরে যায়, এখানেও ঠিক তাই। কিন্তু ছত্রাকের নাম আলাদা।

কোভিড রোগীদের আক্রমণ করে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বা কৃষ্ণ ছত্রাক— যার বৈজ্ঞানিক নাম মিউকোর। এটি এক শ্রেণীর ছত্রাক, যে শ্রেণীর নাম জাইগরমাইসিটিস। ওই পাউরুটির ওপর জন্মানো সবুজ ছত্রাকের নাম পেনিসিলিয়াম, যার থেকে বহুকাল আগে পেনিসিলিন আবিষ্কার করা হয়েছিল। যা এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। পেনিসিলিয়াম শ্রেণীর আরও একটি ক্ষতিকর ছত্রাকের নাম অ্যাসপারজিলাস। অন্য কিছু রোগের ক্ষেত্রে বা অন্য কোনো ভৌগোলিক পরিসরে এটিও এক মারাত্মক সংক্রমণ। (আজকাল অবশ্য শ্রেণীবিন্যাস নতুনভাবে করা হয়েছে। আমি মোটামুটি ভাবে একটা পুরনো শ্রেণীবিন্যাস করে নিলাম সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্যে)।

কোভিড রোগীর ক্ষেত্রে মিউকোর যে সংক্রমণ সৃষ্টি করে, তার নাম মিউকোর মাইকোসিস। ঠিক সময় প্রতিরোধ না করলে এই সংক্রমণ শরীরের নরম টিস্যু অর্থাৎ কোষকলাতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে চোখ, নাক ও মুখের মারাত্মক ক্ষতি করে। অনেক কোভিড রোগী আমাদের দেশে এখন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। মস্তিষ্ক, ফুসফুস ও অন্ত্রেও এর সংক্রমণ হয়।

আমাদের দেশের জলীয় আবহাওয়াতে মিউকোর তার খুব সূক্ষ্ম ও প্রায় অদৃশ্য ফিতার মতো দেহ রোগাক্রান্ত দুর্বল মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে দেয় ও তার প্রজনন কোষ যার নাম স্পোর— খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। প্রতিটি স্পোর ফলের বীজের মতোই বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তাদের খালি চোখে দেখা যায় না। ঠিক সময় ছত্রাক দমন করার ওষুধ না পড়লে এই রোগ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যাওয়া বন্ধ করা অসম্ভব। তাই, আমাদের দেশের হাসপাতালে, হেলথ সেন্টার ও নার্সিংহোমের ডাক্তার ও নার্সদের প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখতে হবে, রোগীর শরীরে মিউকোর- মাইকোসিস হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা।

যে কোনো রোগীর ক্ষেত্রেই বিছানা, চাদর, বালিশ, মাস্ক, খাবার দেওয়ার বাসনপত্র, বাথরুমের দেওয়াল, পাইপ, এয়ার কন্ডিশন যন্ত্র, পাখা, ইলেট্রিক তার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস শুকনো ও পরিষ্কার থাকলে ছত্রাক বংশবৃদ্ধি করতে পারে না ভালো করে। এই শুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতাই কৃষ্ণ ছত্রাকের বেড়ে যাওয়া আটকানোর একমাত্র উপায়। এই বিষয়ে সচেতনতা জরুরি।

লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ। □

বাবা তারকেশ্বরের চরণের সেবায়

অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

চৈত্র মাস এসে পড়লেই ওদের দেখতে পাওয়া যায়। ওরা মানে বিভিন্ন বয়েসের হাজার-হাজার নারী-পুরুষ। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগঞ্জ ও শহরের রাস্তায় রাস্তায় ওরা হাঁটেন। ওদের কপালে তিলক, হাতে মাটির সরা। যেতে যেতে দুয়ারে-দুয়ারে ডাক দিয়ে যান, 'বাবা তারকেশ্বরের চরণের সেবা লাগি। ব্যোম মহাদেব।' বাড়ির গৃহিণী শত ব্যস্ততার মাঝেও চালটা আলুটা ঢেলে দেন সরায়। কখনও নগদ টাকাও এসে পড়ে। মহাদেবের ভক্ত গাঁ-গঞ্জের এইসব মানুষ হাসিমুখে দান স্বীকার করে, 'বাবা তোমার সংসারের মঙ্গল করুন মা'— বলে আশীর্বাদ করে যান।

ভক্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভক্ত গৃহীর এই সম্পর্ক তো আজকের নয়। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের মাটিতে এই সম্পর্কের ধারা বয়ে চলেছে। চৈত্র মাস এলেই গ্রামীণ ও নাগরিক ভারতবর্ষ বুঝতে পারে শিবপুজোর দিন এসে গেছে। আরাধ্যের প্রতি ভক্তির এই ঢেউ এসে পড়ে পশ্চিমবঙ্গেও। বস্তুত আজ থেকে মোটামুটি দেড়শো বছর আগেও চৈত্র সংক্রান্তির গাজন ও চড়ক ছিল বাঙ্গলার সব থেকে জনপ্রিয় উৎসব। কালক্রমে দুর্গাপুজো জনপ্রিয়তায় গাজনকে পিছনে ফেলে দেয়। ব্রিটিশ আমলে বাঙ্গলার সংস্কৃতিকে কলকাতা কেন্দ্রিক করে তোলার প্রয়াস যেমন এর একটি কারণ, ঠিক তেমনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে সাধারণ বাঙ্গালিকে মা দুর্গার অসুরদলনী ভাবশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টাও এর কারণ হতে পারে। তবে গাজন ও চড়ক নিয়ে মানুষের উন্মাদনা আগের থেকে কমে গেলেও, পুরোপুরি লুপ্ত হয়নি। এখনও চৈত্র সংক্রান্তিতে সারা পশ্চিমবঙ্গে গাজন ও চড়ক অনুষ্ঠিত হয়। শহর কলকাতাও উৎসবের এই ঢেউ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। কলকাতার ছাতুবাবু ও লাটুবাবুর বাজারে গাজন উপলক্ষ্যে ঝাঁপ হয়। স্থানীয় মানুষজন ভিড় করে ঝাঁপ দেখেন। সমস্বরে ধ্বনি দেন, 'জয় বাবা বুড়ো শিবের জয়'। কিংবা, 'জয় হাজারি বাবার জয়'। গৃহস্থালীর প্রয়োজনে লাগে এরকম হাজারো জিনিসের বিকিকিনির মেলা বসে। কাঠের তৈরি খাট-আলমারি থেকে শুরু করে কাচের চুড়ি— কী নেই সে মেলায়! সারাদিনের ব্যস্ততার পর যদি কোনও পসারিকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'কেমন হলো বেচা-কেনা?' —ফোকলা দাঁতের কান এঁটো করা হাসিতে জবাব মিলবে। শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে গেলেও ছবিটা একইরকম। কালীঘাটের চড়কের মেলা অতি বিখ্যাত। মেলা যেমন বসে তেমনই বেরোয় শোভাযাত্রা। আগে অল্পবয়েসি যুবকেরা সং সেজে গান গাইত। এখন অবশ্য সেটা আর দেখা যায় না। তবে পোটোপাড়ার প্রবীণদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও ছড়া কাটেন, 'হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটা/গলায় ঝোলে সাপ/ চড়কগাছে পুজো করে আজকে দেব ঝাঁপ।' কালীঘাট থেকে এগিয়ে আরও কিছুটা গেলে দক্ষিণ গড়িয়ার ঢালীপাড়ায় মিলবে চড়ক ও গাজনের এমনই মেলা।

অর্থাৎ কলকাতা শহর বহিরঙ্গ বদলালেও, ভেতরে কোথাও সেই সাবেকি-ই থেকে গেছে। হয়তো হ্যালোজেনের চড়া আলো অতদূরে পৌঁছয়নি। কিংবা সেই গভীরের গোপন আলোর ছটায় হ্যালোজেনের চোখও ধাঁধিয়ে গেছে। ফলে কলকাতা থেকে গেছে কলকাতাতেই। তাই, বিজ্ঞাপনে মুখ ঢেকে দেবার হাজার আয়োজনের মধ্যেও আমরা দিব্যি শুনতে পাই গাজনের ঢাকের শব্দ। এবং 'বাবা তারকনাথের চরণের সেবা লাগি...।' ◻

চড়কের মতো পার্বণ আছে বলে একটুকরো গ্রামবাঙলা এখনোও বেঁচে আছে

এই সাক্ষাৎকারে কালনার ভক্ত্যা ইমন মণ্ডলের সঙ্গে কথা বললেন স্বস্তিকার প্রতিনিধি ভবানী শঙ্কর বাগচি।

□ চড়কের ভক্ত্যা বলে আপনার বেশ নাম-ডাক আছে এলাকায়। কতদিন ধরে চড়কপুজোর সঙ্গে আপনি যুক্ত?

● **ইমন :** আমাদের এই কালনা মহকুমার কৃষ্ণদেবপুর গ্রামের চড়ক কিন্তু খুব বিখ্যাত। এখানে ৮০ বছর ধরে চড়কের উৎসব পালিত হয়ে আসছে। আশেপাশের এলাকা থেকে অনেক মানুষ আমাদের গ্রামের চড়ক মেলা দেখতে আসেন। আমাদের এখানে চড়কের উৎসব চলে সাতদিন ধরে। আমি পরপর তিন বছর চড়কের ভক্ত্যা হয়েছিলাম। তখন পিঠে বঁড়শি ফোঁড়ানো, ঝাঁপ দেওয়া সব করেছি। এখন আমি আমাদের এখানে চড়ক উৎসব পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছি।

□ বঁড়শি ফোঁড়ানো, উঁচু বাঁশে চরকায় দোল খাওয়া, ঝাঁপ দিয়ে ধারালো বঁটি, কাঁটার উপর পড়া, এরকম ঝুঁকিপূর্ণ কসরত দেখাতে বিশেষ মহড়া করতে হয় তাহলে।

● **ইমন :** দেখুন সবার প্রথমে মন শুদ্ধ করতে হবে। তারপর বাবা বুড়ো শিবের প্রতি ভক্তি আনতে হবে। এজন্যই আমরা পুরো একমাস ধরে সন্ন্যাস পালন করি। আমাদের গোত্র হয় বাবা শিবের নামে। বামুন ঠাকুর বুড়ো শিবের নামে সংকল্প করে আমাদের গোত্র বদল করেন এক মাসের জন্য। আগেকার দিনে শুনেছি ভক্ত্যারা সারাবছরই শিবের নাম-গান, পুজো নিয়ে থাকতো। এখন সময় বদলেছে। ভক্ত্যারা অন্যান্য পেশায় ঢুকেছে। কিন্তু চড়কের সময় তারা শিব-নিবেদিত প্রাণ। এখন যারা ৩০ দিন সন্ন্যাস পালন করতে পারে না, তাদের জন্য ৩ দিন, সাতদিন বা পনেরো দিনেরও নিদান আছে। তবে যাই হোক না কেন আসল কথা হলো ভক্তি।

□ এর জন্য বিশেষ কোনো বিধি বা আচার মেনে চলতে হয় কি?

● **ইমন :** চৈত্র মাসের শেষ দিনেই চড়ক পুজো হয়। তার আগের দিন হয় নীলপুজো। ওই দিন শিব-পার্বতীর পুজো করা হয়। নীল পুজো হয়ে যাওয়ার পর কালী ঠাকুরের চালান হয়। চড়কের দিন ভোরবেলায় বঁড়শি, শলাকা, বঁটি ধাতুর সবকিছু ঘষে ঘষে পরিষ্কার করা হয়। ধুয়ে মুছে গঙ্গাজলে শোধন করেন বামুন ঠাকুর। চড়কের ময়দানে যেখানে চড়কের গাছ ঘোরানো হয়, সেখানে দুপুরের দিকে সবাই হাজির হয়। তারপর বাবা বুড়োশিবের অনুমতি নিয়ে ঢাক পিটিয়ে পুকুরে থাকা চড়ক গাছ জাগানো হয়। তারপর তাকে পুজোর জন্য প্রস্তুত করা হয়। এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি, নীলপুজোর আগের দিন হাজারি পুজো করা হয়।

□ **হাজারি পুজো কী?**

● **ইমন :** গ্রাম্য উপকথায় মহাদেবের আরেক রূপ হলো হাজারি ঠাকুর। মহাদেবের পুজোর মতোই হাজারি ঠাকুরকে পুজো করা হয়। ভক্ত্যারা চড়ক পুজোয় ঝাঁপ, বঁড়শি ফোঁড়াই, জিভ ফোঁড়ানোর মতো যেসব অনুষ্ঠান করেন, সেসব যেন নির্বিঘ্নে ঘটে, তার জন্যই হাজারি ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করা হয়।

□ **চড়কের যিনি ভক্ত্যা হন তিনি কি বংশ পরম্পরায় সন্ন্যাসী হন?**

● **ইমন :** বংশ পরম্পরায় ভক্ত্যা হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। আমার যেমন মানত ছিল। আমার বাবা-মা বাবা বুড়োশিবের দোর ধরেছিলেন, তাই আমি সন্ন্যাস নিয়ে বঁড়শি ফুঁড়িয়েছিলাম। সবাই তাই করে। আমাদের পরিবারে আমার কাকাকে ভক্ত্যা হতে দেখেছি। তিনিও বঁড়শি ফোঁড়াতেন।

□ **চড়ক পুজোর কোনো বিশেষ গান আছে কী?**

● **ইমন :** ঝাঁপ বা ফোঁড়াইয়ের সময় ভক্ত্যারা তারস্বরে চিৎকার করে বলেন 'দেবের দেব/মহাদেব/হরগৌরী/জয় শিব' এটাই পরম্পরা অনুসারে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। এই গুরুধ্বনী দিয়েই চড়কের যাবতীয় অনুষ্ঠান হয়।

□ **এই সময়ে আপনাদের খাওয়াদাওয়া কেমন হয়?**

● **ইমন :** ভক্ত্যাদের মধ্যে অনেকে সারা মাস জুড়ে মাধুকরী করেন। চাল-ডাল-সবজি-সহ যা ভিক্ষান্ন পাওয়া যায়, তাই দিয়েই তাদের চালাতে হয়। অনেকে বাড়িতেই নিরামিষ ভোগ রান্না করে খান। যারা স্বল্পদিনের জন্য সন্ন্যাস নেন তাঁরা সাবু, ফলমূল খেয়েই থাকেন। সূর্য ডোবার পর ভাত খাওয়া হয়, তবে চড়কের দিন ভক্ত্যারা মূল পুজো ও অনুষ্ঠান পর্যন্ত উপবাস করেন।

□ **বঁড়শি ফোঁড়াই, জিভে ফোঁড়াই করতে গিয়ে শরীরে ভীষণ কষ্ট হয় তো?**

● **ইমন :** সত্যি কথা বলতে কী, যখন এসব করি, তখন তো এক ধরনের ঘোর লেগে থাকে। ভক্তির ঘোর। আর ওই যে বললাম, নীলপুজোর আগের দিন হাজারি ঠাকুরকে পুজো দিয়ে কালী চালান করা হয়। হাজারি ঠাকুরের কৃপায় চড়কের অনুষ্ঠানের দিন ভক্ত্যাদের কষ্ট, যন্ত্রণা, ব্যথা-বেদনা, কিছুই বোঝা যায় না। তবে তার পরদিন থেকে একটু যন্ত্রণা হয়। চার-পাঁচদিন জায়গাগুলো (ফোঁড়াইয়ের) টাটিয়ে থাকে। টিপে টিপে হাওয়া বের করতে হয়। অনেক সময় রক্ত বেরোয়। তবে সবকিছুই দ্রুত নিরাময় হয়ে যায়।

□ **আগে যেমন চড়কে ভিড় হতো। এখন কি সেরকম হয়? কিছু জায়গায় তো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।**

● **ইমন :** না না, আমাদের এখানে বাবার চড়ক স্বমহিমায় চলে। বরং আগের চেয়ে এখন ভিড় আরও বেশি হয়। আমাদের বাঘনাপাড়ার মাঠে লোক ধরে না। তাছাড়া এগুলো তো লোকাচার বা লোকোৎসব। চড়কের মতো পার্বণ আছে বলে এক টুকরো গ্রামবাঙ্গলা এখানোও বেঁচে আছে। না হলে সব কোথায় হারিয়ে যেত এত দিনে। এখন যেটুকু বদল হয়েছে তা হলো মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। আগেকার দিনে মানুষ এগুলো মানতো, শ্রদ্ধা করতো। এখন বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ ভক্তির থেকে যুক্তিতে বেশি বিশ্বাস করে।

□ **কালনার বাইরে কি কখনো চড়কের অনুষ্ঠানে গেছেন?**

● **ইমন :** হ্যাঁ। কলকাতার বাগুইহাটির কাছে হাতিয়াড়াতে এক বছর আমাদের দল গেছিলো। এবছরই মালদা থেকে যোগাযোগ করেছে। সেখানে অভিজ্ঞ ভক্ত্যারা যাবে চড়কের অনুষ্ঠান করতে।

□ **চড়কের এই যে অনুষ্ঠান হয়, তার মধ্যে দিয়ে সমাজের কাছে কী বার্তা পৌঁছায়?**

● **ইমন :** দেখুন, চড়কের এই যাবতীয় অনুষ্ঠান হয় শিবঠাকুরকে উপলক্ষ্য করে। দেবতাদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে আত্মভোলা, স্ত্রী অন্ত প্রাণ। সর্ব ক্ষমতার অধিকারী। থাকেন আড়ম্বরহীন ভাবে। মানুষের উচিত শিবের ওই অহংকারহীন, অনাড়ম্বর জীবনটাকে অনুসরণ করা। গৃহস্থের উচিত নিজের বউটিকে পার্বতীজ্ঞানে ভক্তি করা। এই বার্তা যেমন থাকে, তেমনি এই সময়টাই গ্রামবাঙ্গলায় নানা রোগের প্রকোপ বাড়ে। এক সময় মহামারী হতো। গতবার যেমন— আমরা করোনাসুর বধের সংকল্প করেছিলাম বুড়ো শিবের কাছে। সেইরকম মানব সমাজের শত্রুস্বরূপকে বধের উদ্দেশ্যে এই চড়ক পুজোর অনুষ্ঠান হয়। ▯

পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গ্রাম পরিক্রমা করে নীল পাগলের দল

সুকল্যাণ জানা

বাঙ্গালির উৎসব শুরু পয়লা বৈশাখে। শেষ চৈত্রের সংক্রান্তিতে। কথায় বলে বারো মাসে তেরো পার্বণ। সব পার্বণেই উৎসবের ষোলোকলা পূর্ণ হওয়া চাই। আহারে-বিহারে, রসেবশেই দিনযাপন বঙ্গ সন্তানের। প্রতিটি উৎসবই কিছু না কিছু মাঙ্গলিক বার্তা বহন করে। বাঙ্গালির তেরো পার্বণের শেষ সোপানটি হলো চৈত্র সংক্রান্তি। চৈত্রের শেষ দিনে চড়ক পুজোর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে পাড়াগাঁয়ের বৈঠকি বটতলা ছাড়িয়ে শহুরে গলির আনাচেকানাচে। কোথাও নীলপুজো, কোথাও গম্ভীরা আর কোথাও শিবের গাজনের আঙ্গিক ধরে শাশ্বত হয়ে আছে 'চৈত্রের চড়ক'।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে ধুমধাম করে পালিত হয় চড়কের লোকোৎসব। সেই মান্ধাতার আমল থেকে পাশুপত সম্প্রদায়ের মধ্যে চড়কপুজোর প্রচলন। সে যুগে শুধুমাত্র অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষই এই পুজোয় শামিল হতেন। ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরানন্দ ঠাকুর সর্বসাধারণের মধ্যে চড়ক পূজার প্রচলন করেন।

বলা হয়, চৈত্র সংক্রান্তির দিনেই শিব-উপাসক বাণ রাজা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্মুখসমরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় নিজের রক্ত দিয়ে মহাদেবকে তুষ্ট করে অভীষ্ট আদায় করেন। সেই স্মৃতিতে শৈব সম্প্রদায়ের অনুসারীরা আজও এই দিনে নিজের শরীর ক্ষতবিক্ষত করে ঝাঁপ দিয়ে এই উৎসব পালন করেন।

'বাঙ্গলায় লোক-সংস্কৃতির বিশ্বকোষ' গ্রন্থে লেখক দুলাল চৌধুরী লিখেছেন, এক সময়ে ঋণে জর্জরিত কৃষকরা ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে, চৈত্রের শেষ দিনে বড়শিতে বেঁধে তাদের বাঁশের চড়কে ঘোরাতো মহাজনেরা। পরে সেটাই চড়কের অঙ্গ হয়ে ওঠে।

কৃষিপ্রধান বাঙ্গলায় একমাস ধরে নিজের গোত্র ত্যাগ করে, শিবগোত্র নিয়ে কঠোর অনুশাসনে সন্ন্যাস পালন করেন মানুষজন।

চড়ক পুজোর আগের দিন চড়ক গাছকে ভালো করে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হয়। তারপর জলভরা একটি পাত্রে শিবলিঙ্গ রাখা হয়। যা বুড়োশিব নামে পরিচিত।

চড়কে কোথাও কোথাও কুমিরের পুজো, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়ে হাঁটা, ধারালো বঁটি, ছুরির উপর ঝাঁপ দেওয়া, শিবের বিয়ে, অগ্নিনৃত্য ইত্যাদি রীতিও পুজোর অঙ্গ হিসেবে প্রচলিত।

কলকাতায় একসময় পদ্মপুকুর, খিদিরপুর ও ভূকৈলাশের রাজবাড়িতে চড়ক পুজোর আসর বসত।

কলকাতার বিখ্যাত ছাতুবাবুর বাজারে সাবেক চড়ক পুজো শুরু হয় ব্যবসায়ী রামদুলাল সরকারদের হাত ধরে। এবার এখানকার চড়কের বয়স হবে ২৫০ বছর।

সাবেক কলকাতার কালীঘাটে একসময় চড়কের মূল আকর্ষণ ছিল

সং সাজা। তৎকালীন নানা ঘটনা, বাবু সমাজের প্রহসনকে কেন্দ্র করে সং সেজে চলিত সংলাপে অভিনয় করে দেখাতো সঙের দল।

চড়ক পুজোর আগেরদিন নীলষষ্ঠীতে শিব-পার্বতীর বিয়ে দেওয়া হয়।

চড়কের দিন সন্ন্যাসীদের একটি দল ঢোল-কাঁসর নিয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নৃত্য করতে বেরোয়। তাদের দলে থাকে শিব-পার্বতী সাজা লোক। তারা বাজনার তালে তালে পা মিলিয়ে সারা গ্রাম ঘুরে নাচ দেখায়। এদের 'দেল' বা নীল পাগলের দল বলা হয়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে, যা চড়ক সংক্রান্তির মেলা নামে পরিচিত। □

দু'শো বছরের পুরনো বাঁকুড়ার মণ্ডলকুলির গাজনের মেলা

আটষট্টি বছর বয়সে আজও চিত্তরঞ্জন পাত্র শহরের কর্মজীবনের ব্যস্ততা থেকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে প্রত্যেক বছর চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে হাজির হন তার গ্রামে ভক্ত্যা হওয়ার টানে। দীর্ঘ ৫০ বছর ভক্ত্যা হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা আলাপচারিতার মাধ্যমে জানালেন স্বস্তিকার প্রতিনিধি অনামিকা দে-কে।

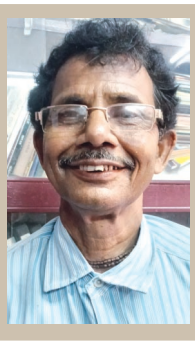

প্রশ্ন : শুনেছি প্রত্যেক বছর ছুটে যান নিজের গ্রামে ঠিক চৈত্র সংক্রান্তির আগে, কী সেই আকর্ষণ?

উত্তর : চৈত্র সংক্রান্তির আগে গ্রামবাঙ্গলার তো একটাই আকর্ষণ, গাজন উৎসব। সবুজে মোড়া আমার গ্রাম বাঁকুড়ার মণ্ডলকুলি। প্রধান আকর্ষণ চৈত্রের শেষে গাজন উৎসব। এখানে গাজন উৎসব এগারো দিনের! শেষের দুদিন মেলা বসে। গ্রামবাঙ্গলার মানুষের এটাই প্রধান আকর্ষণ। তবে আমার আকর্ষণ অন্য। প্রায় দুশো বছরের পুরনো বাপঠাকুরদার আমলের এই গাজনে আমরা বংশ পরম্পরায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছি। সেই টানেই যাই প্রতিবছর।

প্রশ্ন : আপনি কীভাবে যুক্ত এই উৎসবে?

উত্তর : গাজন উৎসবে প্রধান দুই ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসী থাকে, পাটভক্ত্যা ও বালা ভক্ত্যা। ঠাকুরদা নীলমোহন পাত্র প্রতিবছর নিয়ম করে গাজনের এই ক'টাদিন পাটভক্ত্যা হতেন। এরপর বাবা অমরেন্দ্র পাত্র, তাঁকেও দেখেছি ওই এগারো দিন নিষ্ঠাভরে পাটভক্ত্যা হতে। এখন আমার মেজো ভাই মুরলী পাটভক্ত্যার ভূমিকায় থাকে আর আমি সাধারণ ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসী। আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম গাজনের পূজায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি।

প্রশ্ন : প্রথম কবে শুরু হয়েছিল?

উত্তর : তখন আমার বয়স ১৮ বছর, বাবা পাটভক্ত্যা আর আমি ভক্ত্যা।

প্রশ্ন : আপনি তো গলায় তুলসীর মালা পরেন, মন্ত্র উচ্চারণ করেন, ভক্ত্যা হওয়ার জন্য কি কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হওয়া প্রয়োজন?

উত্তর : শিবের গাজন হলো দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা। আমি নিষ্ঠাভরে নিত্য পূজা করি। গলায় তুলসীর মালা দেখছেন কারণ কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছি। আমার শাণ্ডিল্য গোত্র, তবে গাজনের ভক্ত্যা হতে হলে গোত্রান্তর করতে হয়। অর্থাৎ ওই এগারো দিনের জন্য শিবগোত্রে পরিবর্তিত হতে হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন বিকেলে গ্রামের পুকুরে পুণ্যস্নান করে ভেজা কাপড়ে, খালি পায়ে মন্দির অবধি হেঁটে যেতে হয়। এক হাতে থাকে বেতের ছড়ি অন্য হাতে একটি হরিতকি। গলায় উত্তরীয়। প্রথমদিন পাটভক্ত্যা শিবগোত্রে গোত্রান্তর হন। সকলে ওই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভক্ত্যাদের প্রায় ভগবানরূপে গণ্য করে।

প্রশ্ন : এগারো দিনের কৃচ্ছসাধনার অভিজ্ঞতার কথা যদি বলেন।

উত্তর : সারাদিন নির্জলা উপোস থেকে বিকেলে মন্দির থেকে দু' কিলোমিটার পথ হেঁটে প্রতিষ্ঠা করা পুকুরে স্নান করে গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘোরা হয়। সঙ্গে কেউ কেউ শিব সেজে ভক্ত্যাদের সঙ্গে যায়, তাদের বলে 'সং'। মাটির সরায় চাল, ডাল, আলু দেয় বাড়ির গৃহিণীরা। মাটির পাত্রে কাঠের উনুনে হবিষ্যি তৈরি করে খাওয়া হয়। দিনেরবেলা মন্দিরে শিবের নামগান, বিভিন্ন ছড়াকাটা, জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করে উপবাস পালন করা আর বিকেলে হবিষ্যি খেয়ে রাতে খড় বিছিয়ে ঘুমনো— এই ভাবেই গাজনের দিনগুলি পালন করি আমরা। দশমদিন স্থানীয় শ্মশানে মড়া পোড়ানোর কাঠ এক জায়গায় জড়ো করা হয়। পরদিন ভোর ছ'টায় বালা ভক্ত্যা সেই কাঠে আগুন লাগায় এবং পাটভক্ত্যা-সহ অন্য ভক্ত্যারা সেই কাঠের আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়। শেষদিন পাটভক্ত্যা ফলপ্রসাদ খেয়ে পেতলের কলসী নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা পুকুরের জল আনতে যায়। সেই জল ঢালতে হয় বাবার মাথায়। অন্য ভক্ত্যারা ভেজা কাপড়ে দণ্ডি কেটে মন্দিরে ফিরে বাবার মাথায় জল ঢালে। এরপর গোত্রান্তর মন্ত্র বলে আবার নিজ গোত্রে ফিরে যাওয়া— এই হলো রীতি।

প্রশ্ন : মণ্ডলকুলির মেলায় বাণফোঁড়া হয়?

উত্তর : গাজনের মেলায় অনেক ভক্তই মানত করে। নিষ্ঠাভরে বিশ্বাসের সঙ্গে অনেক লোকাচার পালন করে। বাণফোঁড়া, রজনীফোঁড়া এরই অঙ্গ। তবে সবটাই অসম্ভব ভক্তি শ্রদ্ধা থেকে দেবাদিদেবের চরণে নিজেকে নিবেদন করা হয়, তাই বোধহয় মেলা শেষে কোনো ক্ষতেরই চিহ্ন মেলে না ভক্তের শরীরে।

প্রশ্ন : বর্তমান প্রজন্ম কতটা উৎসাহী আপনাদের বংশের এই ধারবাহিকতা বজায় রাখতে?

উত্তর : এখন গ্রামের ছেলে-মেয়েরা মোবাইলের নেটদুনিয়ায় বাইরের সংস্কৃতির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে। আমাদের বাপ-ঠাকুরদার ঐতিহ্য, পরম্পরাগত এই গাজন উৎসব গ্রাম্য লোকসংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ। আগামী প্রজন্মকে একথা স্মরণ করানোর দায়িত্ব আমাদেরই।

ছাতুবাবুর বাজারে কলকাতার সব থেকে পুরনো চড়কের মেলা

ছাতুবাবুর বাজারের চড়কের মেলার পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে অনাথবন্ধু সেবা ট্রাস্ট স্টেট। সংস্থার বর্তমান কর্ণধার পঙ্কজ ঘোষ সম্প্রতি এক আলাপচারিতায় মিলিত হয়েছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে। কথায় কথায় উঠে এল মেলা সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য। স্ব. স.

কবে শুরু

এই মেলা করে শুরু হয়েছিল সেটা বলা মুশকিল। তবে এখন যে জায়গার নাম কোম্পানিবাগান প্রথম মেলা বসেছিল ওখানে। তখন অবশ্য কোম্পানিবাগান নাম ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওই জায়গা লিজ নেওয়ায় কোম্পানিবাগান নাম হয়। কোম্পানি লিজ নেওয়ার পর মেলা উঠে আসে সিমলা বাজার অঞ্চলে। তারপর ছাতুবাবুর বাজারে শুরু হয় মেলা। কত সালে মেলার এইসব স্থান পরিবর্তন হয়েছিল তার রেকর্ড রাখা হয়নি। ফলে সাল-তারিখ বলা সম্ভব নয়। সিমলা বাজারে বেথুন সাহেব স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। তাই মেলা ছাতুবাবুর বাজারে উঠে এলো। এখানে আগে ছিল রামদুলাল সরকারদের আস্তাবল। রামদুলালবাবু এই জায়গা ছেড়ে দেন এবং চড়কের মেলার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠেন। এখনও পর্যন্ত রামদুলাল সরকারের পরিবারই এই মেলার তত্ত্বাবধায়ক। অনাথবন্ধু সেবা ট্রাস্ট স্টেটের অধীনস্থ অনাথবন্ধু ব্যবসায়ী সমিতি শুধুমাত্র পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে।

কী কী হয় এখানে

ছাতুবাবুর বাজার বলতে আমরা যে জায়গাটা চিনি, চড়কের সময় সেটা সম্পূর্ণ ফাঁকা করে দেওয়া হয়। এখানে লাগানো হয় চড়ক গাছ। সন্ন্যাসী বা ভক্তরা পিঠে দড়ি বেঁধে চড়ক গাছে ওঠেন। তাকে চক্রকারে ঘোরানো হয়। চক্র থেকেই চড়ক কথাটির সৃষ্টি বলে আমরা জানি। নীল ষষ্ঠীর দিন এখানে নীলের পুজো যেমন হয়, তেমনি হয় নীলের ঝাঁপ। এসব চড়কের আচারের মধ্যেই পড়ে। এই বিশেষ দিনটির কথা মাথায় রেখেই এখানে একটি অস্থায়ী শিবমন্দির তৈরি করা হয়। ভক্তরা স্নানের পর এখানে পুজো দেন। চড়ক সংক্রান্তির প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে এরকম মেলা কলকাতায় আর একটিও হয় না।

বিখ্যাতদের মধ্যে কে কে এসেছেন

স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন বলে জানি। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ম্যানেজার মহারাজ নামে যিনি পরিচিত তিনি একবার এই মেলায় এসে কথাটা বলেছিলেন। তবে এখানকার যারা বিখ্যাত মানুষ তারা সবাই এসেছিলেন বলেই মনে হয়।

জোড়াসাঁকো এখান থেকে কাছেই। রবীন্দ্রনাথ কখনও আসেননি?

আমি অন্তত রবীন্দ্রনাথের আসার কথা কখনও শুনিনি। একটা কথা কী জানেন তো, চড়কের মেলা খেটে যাওয়া মানুষের উৎসব। কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও, এই উৎসবে অংশ নেন মূলত তথাকথিত নিম্নবর্গীয় মানুষজন। এদের উৎসবে ঠাকুরবাড়ির মতো সম্ভ্রান্তবংশের লোকেরা নাও আসতে পারেন। আমি কথাটা নেতিবাচক অর্থে বলছি না। তখনকার সমাজব্যবস্থা এরকমই ছিল।

শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত— মেলা কি একইরকম আছে?

মূল সুরটা একইরকম আছে। আমি নিজেই তো তিরিশ বছর ধরে মেলা দেখেছি, আমার তো একইরকম লাগে। তবে ইন্টারনেটের যুগে কিছু পরিবর্তন তো হবেই। মেলার বিস্তৃতি এখান থেকে শুরু করে হেদুয়া পার্ক পর্যন্ত। স্থানীয়রা তো বটেই, কলকাতার বাইরে থেকেও অনেক ব্যবসায়ী এসে মেলায় দোকান সাজিয়ে বসেন। এটা একটা অসংগঠিত মেলা। যে-কেউ আসতে পারেন। তার জন্য কারোর কাছে অনুমতি নিতে হয় না।

মেলায় কী ধরনের জিনিস বিক্রি হয়

এক কথায় বললে ঝুড়ি থেকে চুড়ি সবই বিক্রি হয়। ঝুড়ি, চুড়ি, জিলিপি, পাঁপড়, তেলেভাজা, কাঠের জিনিস— কী নেই এই মেলায়। ঘর-সংসারে কাজে লাগে এরকম সব কিছুই এখানে পাওয়া যায়।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে চড়ক উৎসব ও মেলার চাহিদা কীরকম?

আমার মতে দিনরাত মোবাইল ঘেঁটে ঘেঁটে বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা ক্লান্ত। চড়ক গাছ, নীলের ঝাঁপ বা গাজনের মেলায় ওরা নতুনত্ব খুঁজে পায়। তাই ওদের উৎসাহ সাংঘাতিক। বয়স্করা বরং ভিড়ের ভয়ে মেলায় আসতে চান না কিন্তু ওদের সে ভয় নেই।

কখনও কোনও বাধার সম্মুখীন হননি?

আমি যতদিন এই মেলার সঙ্গে যুক্ত ততদিন কোনও বাধা আসেনি। আমার আগে যারা দায়িত্বে ছিলেন তারা বাধা পেয়েছিলেন কিনা জানা নেই। কারণ তার কোনও রেকর্ড নেই।

সরকারি সাহায্য কিছু পেয়েছেন?

কখনও চাইনি। তাই পাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। ডোনেশন আর চাঁদা যা পাই তাতেই আমাদের চলে যায়।

বগটুই হত্যাকাণ্ডে তৃণমূল যোগ প্রমাণিত মাননীয়ার আচরণে

বিশ্বপ্রিয় দাস

গণহত্যার একচেটিয়া দাগ এতদিন ছিল একদা রাজ্য শাসন করা বামেদের। ১৯৭৯ সালের মরিচঝাঁপি হোক বা ২০০০ সালের সুচপুর, ২০০১ সালের ছোটো আঙ্গারিয়া, ২০০৭ সালে এই মার্চেই ঘটেছিল নন্দীগ্রামের ঘটনা, সেখানেও অভিযোগের তির ছিল তৎকালীন শাসক দল সিপিএমের দিকে। এর মধ্যে অবশ্য পুরুলিয়ার ঝালদার ২০১০ সালের ঘটনায় অভিযোগের আঙুল ওঠে মাওবাদীদের দিকে। আবার নেতাইয়ের ঘটনায় ২০১১ সালে আবার অভিযোগ সেই বামেদের দিকেই। এর মধ্যে অবশ্য মুর্শিদাবাদের ডোমকলে রাজনৈতিক হিংসার বলি হন ৩৭ জন। নানা সংবাদপত্রে ২০০৩ সাল, ২০০৮ সাল বা ২০১৩ সালের সেই সব ঘটনা শিরোনামে জায়গা পায়।

রাজ্যের শাসকদল বদল হলো। মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠন হলো। তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী নিজের ঢাক নিজেই পেটাতে শুরু করলেন। রাজ্যে নাকি একেবারে শান্তির আবহাওয়া। সেই আবহাওয়ায় তলে তলে তাঁর ভাইয়েদের বাহুবলী চরিত্র গঠন যে শুরু হয়েছে সেটা যদি বলা হয় তিনি জানতেন না, তাহলে একটু অবাক হতে হয় বইকি। তাঁর অনুপ্রেরণায় পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় যেমন সিন্ডিকেট ও তোলাবাজ তৈরি হলো, তেমনি সাধারণ মানুষকে দমিয়ে রেখে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার একটা প্রক্রিয়াও শুরু হলো। তাঁর প্রতিফলন সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বীরভূমের রামপুরহাটের বগটুই গ্রামে যে নারকীয় গণহত্যা সংগঠিত হলো, যে গণহত্যায় আগুনে পুড়ে, ঝলসে মৃত্যু হলো ৮ জনের। তাঁর মধ্যে আছে শিশুরাও। কত নৃশংসতা থাকলে এরকম একটি হত্যা লীলা ঘটতে পারে, সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে এই ঘটনায়। কেন এই হত্যা লীলা? প্রথমে আসা যাক উপপ্রধান ভাদু শেখের খুনের ঘটনায়। দুষ্কৃতীদের হাতে নৃসংশ ভাবে খুন হন ভাদু শেখ। আর তার পরেই ঘটে যায় সেই ঘটনা। বগটুইয়ের একের পর এক বাড়িতে লাগানো হয় আগুন। মিহিলাল শেখের প্রায় চোখের সামনেই আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যায় স্ত্রী ও পরিবারের মানুষজন। ওদিকে ভাদু শেখের বাড়ির মানুষজন সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেন যে বালি খাদানের ভাগবাটোয়ারার জন্যই খুন হতে হয়েছে ভাদুকে। তাহলে কি রাজ্যের শাসক দলের সমর্থকদের মধ্যে এলাকা দখলের লড়াই আর গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কারণেই এই নারকীয় হত্যা কাণ্ড?

এক আত্মীয়ের কথায়, আগুন লাগার আগের মুহূর্তে নাকি মোবাইলে কথোপকথন যা হয়েছিল, তার সারমর্ম ছিল, তাদের বাড়ি ঘিরে ধরে, দরজা আটকে, তেল দিয়ে ভিজিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। নানা সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে আত্মীয়ের সেই কথা। সোনা শেখের বাড়ি-সহ আশপাশের আরও কয়েকটি বাড়িতে কেন এভাবে আগুন লাগানো হলো? কেনই-বা উপপ্রধান ভাদু শেখের হত্যাকাণ্ডের পরপরই এই ঘটনা? সেটি সাধারণ বুদ্ধিতে অনেকেরই আসছে না।

রাজ্যের এক অবিবেচক মন্ত্রী, তিনি আবার মেয়র বটে। পাশে বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডলকে বসিয়ে বলেই ফেললেন, এই নারকীয় হত্যালীলা একটি বিরোধী চক্রান্ত। অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ২৫ মার্চ, ঘটনা ঘটার প্রায় দুদিন পর ঘটনাস্থলে গেলেন। স্বভাব সিদ্ধ নাটকীয় ভঙ্গিমায় অরণ্যরোদন করে কুম্ভীরাশ্রু ফেলে, নিহত ও আহতদের পরিবারের হাতে তুলে দিলেন আর্থিক সাহায্য। এরপর তিনি দায়ী করলেন নিজের হাতে থাকা পুলিশ কর্মীদের। বলির পাঁঠা হয়ে বেশ কিছু পুলিশ কর্মীকে হাড়িকাঠে মাথা দিতে হলো তাঁর নির্দেশে। সেই পুলিশের বিরুদ্ধেই প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন খোদ পুলিশ মন্ত্রী। এভাবেই দায় এড়ালেন তিনি। অন্যদিকে সবাইকে অবাক করে নিজের দলের অন্যতম নেতাকে একেবারে সরাসরি এই ঘটনার জন্য দায়ী করে দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আনারুল হোসেনকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিলেন তিনি। যদিও বিশাল পুলিশ বাহিনী আনারুলের বাড়িতে গিয়ে তার টিকিটি খুঁজে পাননি। রাজনৈতিক মহলের মতে এটাও একটা নাটক শাসক দলের। অনেক আগে থেকেই আনারুলকে অজ্ঞাত স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে অবশ্য তৎপর হয় পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর আনারুলকে গ্রেপ্তার করার কথা বলার এক ঘণ্টার মধ্যেই তারাপীঠ থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আনারুলকে। রাজনৈতিক মহলের মতে এই অঞ্চলের বালিপাচার চক্র ও পাথর পাচার চক্র তৃণমূলের সিন্ডিকেটের এলাকা দখলের লড়াইতে এই নারকীয় হত্যালীলা।

আনারুল হোসেন

রাজ্যের শাসকল দল বারে বারেই উদাহরণ হিসেবে টেনে আনে অন্য রাজ্যের নানা ঘটনা। হাথরসে মৃত ধর্ষিতার দেহ রাত্রে পুড়িয়ে দেবার বিরুদ্ধে রাজ্য তৃণমূল গলা উঁচিয়ে রাজ্যের সংবাদমাধ্যমে উগরে দিয়েছিল নানা কথা। সংবাদমাধ্যম ফলাও করে প্রচার করেছে সেই সব। কিন্তু এবার যখন রাতের অন্ধকারে সৎকার করা হলো বগটুইয়ের নারকীয় হত্যাকাণ্ডে মৃতদের, তখন শাসক দল কী বলছেন? কোথায় সংবাদমাধ্যমের সেই ফলাও করে প্রচার? কোথায় রাজ্যের সেই তাঁবেদার তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা? তাঁদের দেখা যায়নি ঘটনা ঘটার পরেও। কোথায় গেলেন তাঁরা?

বঙ্গ বিদ্যার্থী-র আলোচনাসভা ও পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ কলকাতা শাখার বঙ্গ বিদ্যার্থীর উদ্যোগে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে গত ২১ মার্চ কলকাতার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউশন অব এশিয়ান স্টাডিজে 'বঙ্গের বিপ্লবী সমাজ' শীর্ষক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাষ্ট্রীয় সহ সম্পাদক শ্রীনিবাস, প্রাক্তন সেনা অধিকর্তা কর্নেল সব্যসাচী বাগচী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ, এবিভিপি-র রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, এবিভিপি-র পূর্ব ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক অপাংশুশেখর শীল, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক সপ্তর্ষি সরকার। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যে স্বপ্নের ভারতবর্ষ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন সেই স্বপ্ন কতটা পূর্ণ হয়েছে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে সেই কথা বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে। সকলেই বলেন, ভারতের স্বাধীনতা বিনা অস্ত্রে বা বিনা রক্তপাতে মিলেছে তা সর্বৈব মিথ্যা কথা। আলোচনায় উঠে আসে পরাধীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতায় বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের স্থানগুলি সংরক্ষণ করার বিষয়টি। অনুষ্ঠানে 'অগ্নিযুগের যাজ্ঞসেনী' ও 'আহুতির মহৎ প্রাণ' নামে দুটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়। পুস্তকদুটির লেখক ড. সুমনচন্দ্র দাস। ১৩০ জন অনামা অখ্যাত বিপ্লবীর পরিচয়ের উদ্দেশে এই পুস্তক প্রকাশ। বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন শোধ ও তুহিনা প্রকাশনী।

স্বাবলম্বী ভারত অভিযান সমন্বয় বৈঠক

দেশের মানুষকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে ভারত জুড়ে গঠিত হলো স্বাবলম্বী ভারত অভিযান। গত ২০ মার্চ কলকাতার

মানিকতলায় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের কার্যালয় নরেশ ভবনে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে স্বাবলম্বী ভারত অভিযানের সমন্বয় বৈঠক সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সহ সংযোজক ও স্বাবলম্বী ভারত অভিযানের পূর্বাঞ্চলের সমন্বয়ক ড. ধনপতরাম আগরওয়াল, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক অধ্যাপক নির্মল মাইতি, লঘু উদ্যোগ ভারতীর রাষ্ট্রীয় কার্যকারিণীর সদস্য সরোজ সাহু, সহকার ভারতীর পূর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক বিবেকানন্দ পাত্র, শ্রীমতী নন্দিনী রায়, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক গণেশ মিশ্রা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি শান্তনু মুখার্জি, ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গের সহ সভাপতি আশিস সরকার, অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের অখিল ভারতীয় কেন্দ্রীয় কার্যকারিণীর সদস্য কমল ঘোষ দস্তিদার। আন্তর্জালিক মাধ্যমে দিল্লি থেকে অংশ নিয়েছিলেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক কাশ্মীরিলালজী ও অখিল ভারতীয় সহ সংগঠন সম্পাদক সতীশ কুমার। স্বাবলম্বী ভারত অভিযানের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সমন্বয়ক সুবীর রায়চৌধুরী এবং স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের কলকাতা মহানগর সংযোজক সব্যসাচী ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যালয় প্রমুখ সৌরীন গোস্বামীও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ৮০ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

মুরারীপুরে হুতাত্মা প্রশান্ত মণ্ডল বলিদান দিবস উদ্‌যাপন

১৬ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার মুরারীপুর গ্রামের সঙ্ঘের শাখায় উদ্‌যাপিত হলো হুতাত্মা প্রশান্ত মণ্ডল বলিদান দিবস। জেলার বিভিন্ন শাখা থেকে আগত স্বয়ংসেবকরা স্মারক বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। স্মৃতিচারণা করেন কমলেন্দু ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য মুটুকেশ্বর পাল। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালের ১৫ মার্চ সঙ্ঘের শাখায় স্থানীয় বামপন্থী গুন্ডারা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে নির্মমভাবে প্রশান্ত মণ্ডলকে হত্যা করে।

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন বাঙ্গালির শিকড়ে রয়েছেন শ্রীরামচন্দ্র

কল্যাণ গৌতম

একই দেহে রাম আর কৃষ্ণ মধুর; একতারাতে দোঁহে বাঁধা। অথচ অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকাশের মধ্যে কিছু দুর্বুদ্ধিজীবী যেভাবে তাঁর 'শ্রীরাম সত্তা'-কে লুকিয়ে রাখতে চান, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের, রানি রাসমণির, স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীরাম সাধনার ধারা ভুলে গেছে বাঙ্গালি। স্বামী বিবেকানন্দের বীরভাব, বীর সন্ন্যাসের রূপ যে শ্রীরাম সাধনার ধারাতেই সম্ভব হয়েছিল, তার খোঁজ পাননি তারা। ঠাকুর নিজে আদরের নরেনকে নিজের ইষ্টদেবতা রঘুবীরের মন্ত্র দিয়েছিলেন।

গদাধর-শ্রীরামকৃষ্ণের পিতামহ মানিকরামের দিন কাটতো রঘুবীরের সেবায়। পিতা ক্ষুদিরাম রঘুবীরের পুজো না করে জলস্পর্শ করতেন না। বাসভূমি 'দেড়ে' গ্রাম ছেড়ে জমিদারের অত্যাচারে যখন কামারপুকুর আসতে হলো, তখন প্রায় কর্মহীন ক্ষুদিরামের সিংহভাগ সময় কাটতো আরাধ্য রঘুবীরকে নিয়ে। রামই তখন তাঁর একমাত্র শান্তি, প্রাণের আরাম। এই রঘুবীরই হয়ে উঠলেন আদরের রামলালা, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহদেবতা।

মানিকরাম-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের বংশের বহু মানুষের নামের মধ্যে 'রাম' কথাটি যুক্ত। বাঙ্গালির জীবনে এ কীসের প্রতীক? নিশ্চয়ই অচেতন ভাবে হয়নি এসব! এক-দুই প্রজন্ম আগেও বাঙ্গালির নামকরণে 'রাম' এসে যুক্ত হয়ে পড়তেন। মানিকরামের বড়ো ছেলে গদাধরের পিতা 'ক্ষুদিরাম'। মানিকরামের অন্য দুই ছেলে 'নিধিরাম', 'কানাইরাম', মেয়ের নাম 'রামশিলা'। রামকৃষ্ণের বড়োভাই 'রামকুমার', মেজোভাই 'রামেশ্বর'। কানাইরামের বড়ো ছেলে 'রামতারক'। রামশীলার বড়ো ছেলে 'রামচাঁদ'। রামশীলার দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর নাম 'রাঘব', 'রামরতন', 'হৃদয়রাম',

‘রাজারাম’।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাসমণির ঘরেও ছিলেন রঘুবীর। একবার গ্রীষ্মে এসে হাজির এক অপরিচিত সন্ন্যাসী। তাঁর স্বামী রাজচন্দ্রের সাক্ষাৎ চান। পীড়াপীড়ি করছেন দেউড়িতে, অবশেষে অনুমতি পেলেন দারোয়ানের। দোতলায় গেলেন সন্ন্যাসী রাজচন্দ্রের কাছে, ‘আমার কাছে রঘুনাথজিউ শিলা আছেন। আপনাকে দেবো। আপনি সেবা করবেন। আপনার মঙ্গল হবে। আমি বহুদূর তীর্থদর্শনে যাবো; ফিরবো কিনা সন্দেহ।’ সন্ন্যাসী রাজচন্দ্রকে শিলা অর্পণ করলেন। বিনিময়ে কিছুই নিলেন না, বিদায় নিলেন। সেই থেকে রঘুনাথজীর প্রতিষ্ঠা হলো রাসমণির ঠাকুর ঘরে। রাজচন্দ্র পাশে রুপোর হনুমান মূর্তি গড়ে দিলেন। মাহিষ্য জমিদার পরিবারে কুলদেবতা হলেন রঘুনাথজিউ।

শ্রীরামকৃষ্ণের দাদা রামকুমার কেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সেবাকাজের ভার পেলেন? নানান কারণের মধ্যে অন্যতম হলো দুজনেই রঘুবীরের উপাসক, এক আশ্চর্য সমাপতন। রাসমণি কি চাননি শ্রীরাম ঘরানার কোনো পুরোহিতই আদ্যাশক্তির ভার নিন! রাম যোদ্ধা, ক্ষত্রিয় বীর। মা-কালী অসুর-দলনী। দেশপ্রেমী জমিদার গিন্নীর নেপথ্য ভাবনা কি ছিল না বাঙ্গলায় বীর সাধনার পীঠ তৈরি হোক? সমন্বয় হোক রাম-কালীর!

শ্রীরামকৃষ্ণ জটাধারী রামাইত সাধুর কাছ থেকে রামলালা পেয়েছিলেন। অষ্টধাতুর শৈশব মূর্তি। রামলালাই হলো তখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। শিশুমূর্তিতে প্রেমাকুল তিনি। অনুভূতি হলো, জ্যোতির্ময় শ্যামবর্ণ শ্রীরাম নিত্য পুজো নিচ্ছেন তাঁর। রামাইত সাধু রামপূজন করেন, করেন সাধন-ভজন-আরাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখছেন। মন চাইলো, মায়ের স্নেহে রামলালাকে তিনি সেবা করেন। আগ্রহ দেখে সাধু রামলালার মন্ত্র দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ রামের অনুসারী হলেন। দিব্যলীলা দেখে সাধু শ্রীরামকৃষ্ণকেই দিয়ে গেলেন বিগ্রহ। এক উপযুক্ত উত্তরাধিকার বটে। বাঙ্গালিকে এইসব ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। রামকে অবাঙ্গালির দেবতা করে রাখলে যে বাঙ্গলায় আটকানো যায় রামরথ!

রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলছেন, ‘এতকাল আমাদের দেশের যে কেহ অক্ষর মাত্র পড়িতে জানিত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরামদাসের মহাভারত না পড়িয়া ছাড়িত না; যাহার অক্ষরবোধ ছিল না, সে অন্যের মুখ হইতে শুনিত। এই রামায়ণ, মহাভারত আমাদের সমস্ত জাতির মনের খাদ্য ছিল, এই দুই মহাগ্রন্থই আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আজকাল আমরা যাহাকে শিক্ষিত সম্প্রদায় বলি, সেই সমাজে এই দুই গ্রন্থ এখন আর কেহ পড়ে না।’ রামায়ণ মহাভারত না পড়ার হতাশা অন্যত্রও লিখে গিয়েছেন, ‘কৃত্তিবাসের রামায়ণ যদি বাঙ্গালি ছেলে-মেয়েরা না পড়ে তবে তার চেয়ে শোচনীয় আশঙ্কা আমাদের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না।’ রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন শিশুপাঠ্যে শিশুকে সবসময় তার ঐতিহ্যের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দিতে হয়। ঐতিহ্যের শিক্ষার মধ্যেই শিশুকে সবচাইতে ভালোভাবে শিক্ষিত করা সম্ভব। শিশুকে যথোপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠতে সহায়তা করে দেশ ও তার ঐতিহ্য। একইভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যে অন্বিত রামায়ণের অমোচ্য কলম, যাকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না কোনোদিনও। ‘তোরা যে যা বলিস ভাই/আমার সোনার হরিণ চাই।’ ‘ভারতীয় মহাকাব্য যে ভারতের ইতিহাস, তা বলার ক্ষেত্রে স্পষ্টবাদী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে; কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।’

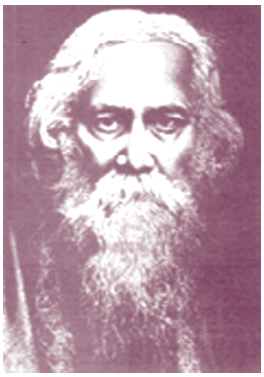

সবচাইতে বেশি দাগানো বই যা রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন এবং বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে আজও সংরক্ষিত আছে, তা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত ‘কৃত্তিবাস রামায়ণ’।

রাম বাঙ্গালির দেবতা নয়, এটা বিবিধ রাজনৈতিক দল প্রায়ই বলে থাকে। তারা বলে, রাম উত্তর ভারতের গুটকাখোরদের দেবতা। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ যদি মেলে ধরা হয়, তারা প্রবল অস্বস্তির সম্মুখীন হন। বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কৃত্তিবাসী পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার হলে হয়তো বিনষ্ট হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকতো। নেহাত ১৮০২-০৩ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস পাঁচ খণ্ডে ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’ প্রকাশ করে ফেলেছিল তাই রক্ষে!

তা কবে থেকে বাঙ্গালি রামনামে জারিত? কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালীর স্বাদ বাঙ্গালি পেয়েছে অন্তত ছ’শো বছর আগে। অনুমান করা যায় তার আগে থেকেই বাঙ্গলার প্রবুদ্ধ-মহলে সংস্কৃত বাল্মীকি- রামায়ণের চর্চা ছিল এবং লোককথায় তার অবিসংবাদিত বিস্তারও ছিল। লোকায়ত-মানসে এমন শক্ত ভিত্তি না থাকলে কৃত্তিবাস এমন জনপ্রিয় ও লোকপ্রিয় রামায়ণ কাব্য লিখতে প্রেরণা পেতেন না।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, রামায়ণ-বিরোধিতা করতে গিয়ে হিন্দু বিরোধী ভ্রান্ত-সেকুলারি সমাজ শ্রীরামকে অবাঙ্গালির দেবতা বলে দেগে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে তুলসীদাসী রামচরিতমানস লেখা হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেক পরে। সম্ভবত রামজন্মভূমি বিতর্কে বাঙ্গালিকে শামিল না করানোর 'সেকুলারি-চালাকি' ছিল 'অসত্য কথা-বলা ইতিহাসবেত্তা'দের। স্বামী বিবেকানন্দের রাম-উপাসনাও বাঙ্গালি ভুলে গেছে। বাঙ্গালি কীভাবে ভুলে যায় বাঙ্গলার ঘরে ঘরে জপিত-মহামন্ত্র— 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ/কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম/রাম রাম হরে হরে।'

কৃত্তিবাসী রামায়ণ নিয়ে বামপন্থীদের যথেষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ কাজ করে, তার একটি ছোট্ট পরিচয় তুলে ধরা যাক। মহাশ্বেতা দেবী কোনো এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, 'কৃত্তিবাসের রামায়ণে আলাদা করে কোনো অন্ত্যজ ভাবনা থাকতে পারে না। তিনি সংস্কৃত রামায়ণ অসামান্য ভাষায় ও ছন্দে বাঙ্গলায় লিখেছিলেন মাত্র।' কিন্তু সত্যিই কি তাই?

১. শ্রীরামের সঙ্গে চণ্ডাল গুহকের মিতালি কবি কৃত্তিবাস যে ভাষায় বলেছেন, তারপর মহাশ্বেতা দেবীর বলা উচিত হয়নি যে কৃত্তিবাসে অন্ত্যজ ভাবনা অনুপস্থিত। কৃত্তিবাস লিখছেন, 'চণ্ডাল বলিয়া যদি ঘৃণা কর মনে/পতিত পাবন নাম তবে কি কারণে।'

মনে রাখার মতো বিষয় এই, কৃত্তিবাস যখন এমন কথা লিখছেন, তখনও আবির্ভূত হননি সাম্যবাদী ভক্তি আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রীচৈতন্য। এমন মানুষের সাহিত্য কীর্তি নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর 'সাড়েচ্ছয়ানা' টাইপের মন্তব্য আমাদের ব্যথিত করে।

২. সুগ্রীবের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের সখ্য, বানরকুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কীসের ইঙ্গিতবাহী?

৩. অন্ত্যজ মানুষের হাতে শ্রীরামচন্দ্র ফল গ্রহণ করছেন, সেই জায়গাতেও কৃত্তিবাস মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

রামায়ণের শিকড় যে কতটা মজবুত তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে নানান জনজাতি কৌমগোষ্ঠীর পুরাণ কথাতেও। একটি বিরহ লোককথা, 'রাম-সীতা-হনুমান' গল্প; সেখানে শোনানো হয়েছে তেঁতুল আর খেঁজুর পাতার অভিযোজনের গল্প। গল্পটি জনজাতি সমাজে প্রচলিত অনেকানেক গল্পের মতোই, যা প্রমাণ করে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি জনজাতি কৌমসমাজেরও উত্তরাধিকার।

বামপন্থী নানান ন্যারেশনে রামচরিত্রকে ছোটো করে দেখানো হয়েছে, সমকালকে বিচার না করে তাঁর চরিত্রের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে নানান অসঙ্গতি। অথচ রবীন্দ্রনাথ দেবর্ষি নারদকে দিয়ে বলাচ্ছেন রামচরিত্রের অপূর্বতা, অমৃতভাষণ :

'কহো মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম—
কহো মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম।'
নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম।।'

(কবিতা 'ভাষা ও ছন্দ')

আমরা দেখি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে ঈশ্বর মানতেন না, তা প্রমাণ করতে বামপন্থীরা খুবই যত্নবান ছিলেন। অথচ বিদ্যাসাগরই লিখেছিলেন রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে 'সীতার বনবাস'। সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছেলেদের রামায়ণ ও মহাভারত লিখে মহাকাব্য পড়ার একটি কৈশোর জীবন তৈরি করে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের সেরা ভাষ্যকার। কারণ তিনি রামায়ণের কাহিনিতে জারিত হয়েছিলেন। আর তা আত্তীকরণ করে তা সুপাচ্য সাহিত্য-ব্যঞ্জন রূপে পরিবেশন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বহু সাহিত্য-কর্ম তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের অধ্যয়ন নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের লেখা থেকে জানা যায়, সবচাইতে বেশি দাগানো বই যা তিনি পড়েছিলেন এবং বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে আজও সংরক্ষিত আছে, তা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত (১৩৪৩) 'কৃত্তিবাস রামায়ণ'। রবীন্দ্রনাথের দু'টি গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১২৮৭) এবং 'কালমৃগয়া' (১২৮৯)-য় সংস্কৃত রামায়ণের প্রভাব রয়েছে। নানান কবিতার কাহিনি নির্মাণ হয়েছে রামায়ণের গভীর পাঠ অনুসরণ করে।

রবীন্দ্রনাথ দু'ভাবে শিশুকে রামায়ণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিচ্ছেন, নামবাচক শব্দে এবং প্রকৃতি চিত্রণে। কখনো নাম না বলেই শিশু রামায়ণের দেশে পাড়ি দিয়েছে— 'মা গো, আমায় দেনা কেন/একটি ছোটো ভাই—/দুইজনেতে মিলে আমরা/বনে চলে যাই।' এখানে নাম না করেও শিশু নিজের সঙ্গে শ্রীরামকে অভেদ কল্পনা করেছে, ছোটো ভাইটি যে সহোদর লক্ষ্মণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজপুত্রের বনবাসী হয়ে যাওয়া বাঙ্গালি তথা ভারতীয় শিশুর মানস-কল্পনায় কতটা প্রভাব এনেছিল, 'সহজপাঠ'-এর একটি কবিতায় কবি তা এক লহমায় ধরে দিয়েছেন— 'ঐখানে মা পুকুরপাড়ে/জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে/হোথায় হব বনবাসী—/কেউ কোথাও নেই।/ঐখানে ঝাউতলা জুড়ে বাঁধবো তোমার ছোট্ট কুঁড়ে,/শুকনো পাতা বিছিয়ে ঘরে/থাকব দুজনেই।' কী বলবেন একে? পারবেন তো এই শিকড়কে কেটে দিতে! আমার কিন্তু একজন রবীন্দ্রনাথ আছেন। আপনার?

(শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

চৈত্র সংক্রান্তি আর গাজনের দিনগুলো

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

চৈত্র সংক্রান্তির দিনটিকে বলা হতো 'ছাতু সংক্রান্তি'। বাড়িতে আগের দিন দোকান থেকে এনে রাখা হতো ছোলার ছাতু, যবের ছাতু, খইয়ের ছাতু। অনেক বাড়িতে অসচ্ছলতায় আটা ভেজে তৈরি করা হতো ছাতু, কিনে আনা হতো সস্তাদরের খেসারির ছাতু। অনেক অসাধু দোকানদার সেই সময়ে ছোলার ছাতুতে খেসারি মেশাতেন। খেসারি খাওয়ায় তখন পক্ষাঘাতের ভয় ছিল। ভেজাল এড়াতে দুই-একবার মা বাড়িতেই বালির কড়াইয়ে ভেজে নিলেন ছোলা আর যব। ভাজার সময় সুন্দর একটা মিষ্টি গন্ধে ভরে উঠত চারপাশটা। তারপর লোহার হামানদিস্তায় গুঁড়ো করে নেওয়া হতো ভাজা ছোলা, যব। তার দানাময় গুঁড়ো এরপর শিল নোড়ায় বেটে নিতেন মা। তিনি সেদিন চাল ভেজে তৈরি করতেন মুড়ি, এই মুড়ি গুঁড়িয়ে যে ছাতু হতো, তা অসাধারণ খেতে। মনে আছে ছুটির দিন দুপুরের শেষ আঁচে আমি নিজেই কতকটা আটা ভেজে ছাতু করে নিতাম। মা বলতেন আটার ছাতুতে অম্বল হয়। তখন আমি ছোটো, কে আর অম্বলের ধার ধারে! চৈত্র সংক্রান্তির দিন সকাল সকাল স্নান করে ছাতু খাওয়ার আলাদা আনন্দ। সেদিন ছাতুই জলখাবার। সঙ্গে থাকে ভেলিগুড়, কাঁঠালি কলা, দই, সন্দেশ। সেদিন উল্লাসই আলাদা, সব বাচ্চারা নাচানাচি করতে থাকি। বাড়িওয়ালার বাড়িতে, হারামামির (হারাধন চ্যাটার্জির সহধর্মিণীকে পাড়ার সবাই এই নামেই ডাকতেন) বাড়িতে, গীতু- মিতুদের বাড়িতে রকমারি ছাতুর আয়োজন। কারও বাড়ি গেলেও ছাতুমাখা খেতে দেন। উপাদান, পরিমাণ আর মাখার গুণে এক এক বাড়িতে এক এক স্বাদের মনে হয়।

রানি চন্দের লেখায় পাই, 'চৈত্র সংক্রান্তি— 'ভাইছাতুর' দিন। তিন মাথায় (তে-পথের মোড়ে) ভাই দাঁড়ায়, বোন মুঠো মুঠো খইয়ের ছাতু ভাইয়ের পায়ের ফাঁক দিয়ে উড়িয়ে দেয়— বার বার তিনবার। বলে— 'ভাইয়ের শত্রু নিপাত হোক।' মায়ের অনেক ভাই, মা অনেক ছাতু ওড়ান। তে-মাথার পথটা সাদা হয়ে যায়।' আমার মা বলতেন, পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে এই প্রথা দেখেছেন, করেওছেন। ছাতুতে সাদা রাস্তায় কুকুর চেটে যায়। নানান পিঁপড়ের দল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাকি ছাতু মুখে করে নিয়ে গর্তে ঢোকে। নবান্নের 'কাক-বলির' মতোই প্রকৃতির রাজ্যে নানান প্রাণীকুলের প্রতি কৃতকৃত্য। কিন্তু উদ্বাস্তু বাঙ্গালির হাতে তখন পয়সা কই ছাতু ওড়ানোর! তাই বলা হতো, সেদিন ছাতু খেলে শত্রু নিধন হয়।

সারা চৈত্রমাস ধরে যারা গাজন দলের সং সেজে এসেছে, যারা বাবা তারকনাথের নামে মাটির মালসায় ভিক্ষান্ন মেগেছে, আজ তাদের শিবের পুজো। এদিন আর তাদের দেখি না। রহড়ায় কাছাকাছি চড়কমেলার আয়োজন কখনও দেখতে যাওয়া হয়নি। শুনেছি অনেক আগে সুখচরে নাকি গাজনের বড়ো মেলা বসত। আমাদের ছোটোবেলা দেখেছি মাস জুড়ে রোজই কেউ না কেউ গাজন সন্ন্যাসী ভিক্ষা করতে আসত— খালি পায়ে গেরুয়া খাটো ধুতি, খালি গায়ে ভস্ম মাখা, উত্তরীয় গলায় জড়ানো, কাঁধে গেরুয়া থলে, হাতে ত্রিশূল। গলবস্ত্র হয়ে অন্য হাতে মাটির মালসা গৃহস্থের কাছে ভিক্ষার্থে এগিয়ে দেবার আগে সুর করে গায়, 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে/বাবা মহাদেবের...!' খুবই স্বাভাবিক ও পরিচিত ব্যাপার ছিল সেই সময়। গাজন সন্ন্যাসিনীরাও থাকতেন, কখনও জোড় বেঁধে আসতেন গাজন সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী। জানতাম এঁরাই যথার্থ শৈবপন্থী। বংশানুক্রমে গাজনের মাসে সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন তাঁদের। আবার অনেকে হয়তো অভাবের তাড়নায় এই সুযোগে ভিক্ষাবৃত্তি করে নিতেন। গরিব ঘরের এই শৈব-ভিখারিদের অধিকাংশই শ্রমিক-মজুর বা কৃষক ঘরের মানুষ, কেউ কেউ বাজারের সবজি-বেচা হাটুরে। তেল-সাবান না মেখে মাসভর তাঁরা দিনে উপবাসী, সন্ধ্যায় শিবের পুজো করে একবেলা নিরামিষভোজী।

তবে গ্রামগঞ্জে ছেলেছোকড়ার দল গাজনে মাতে। তাদের দলে একজন মূল হোতা বা মুরুব্বি থাকে, তাকে ঘিরে একদল অনুচর। তিনিই যেন শিব, বাকিরা নন্দী-ভৃঙ্গী, তাদের মধ্যে একজন কালীও সাজে। রানি চন্দের লেখায় পাচ্ছি, 'চৈত্রমাস পড়লে ছোটোমামাকে আর পাওয়া যায় না বাড়িতে। তিনি নীলপূজার গাজনে মাতেন। মা-মামারা রাগ করেন; কিন্তু যারা গাজনে মাতে— তারা সবাই ছোটোমামার অনুচর। মুরুব্বিকে নইলে জমে না তাদের।... গাজনের দল এ সময় বাড়ি বাড়ি আসে, সবাই মিলে তাণ্ডব নাচ নাচে, গায়। ছোটোমামাও সেইসঙ্গে থাকেন, দলের সঙ্গে নাচেন, গান; কেবল নিজ বাড়ির ধারে-কাছে আসেন না কখনো।... মামিরা কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছেন— এবারে গাজনের আসল সন্ন্যাসীকে দেখতে পাবেন; কিন্তু আমাদের বাড়ির দু'তিনটে বাড়ির আগে হতেই পলকে ছোটোমামা উধাও হয়ে যান। কখন যান— কেউ ধরতে পারে না। ছোটোমামা বাড়িতে ফেরেন চড়ক পূজার মেলা শেষ করে। আমাদের জন্য নিয়ে আসেন রঙিন কাগজের ফুল, শোলার টিয়ে পাখি, পয়সা জমাবার পেট ফাঁপা মাটির বুড়ো— আরও নানা জিনিস। বউঠানদের জন্যও লুকিয়ে লুকিয়ে এনে দেন অনেক কিছু। মামিরা খুশি থাকেন ছোটো দেওরের প্রতি।'

(লেখক বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্টিকালচার ফ্যাকাল্টির বিশিষ্ট অধ্যাপক)

শিবের সঙ্গে কালীর বিবাহে গাজন সন্ন্যাসীরা বরপক্ষ

হীরক কর

গ্রামবাঙ্গলার একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় উৎসব, 'গাজন'। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ জুড়ে সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যাদের মাধ্যমে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কপূজার সঙ্গে এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। ধর্মের গাজন সাধারণত বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে পালিত হয়।

শীতের প্রকোপ বিদায় নিলে প্রকৃতির বুকে ফিরে আসে প্রাণের জোয়ার। আমলকী, শিরীষের ডালে এখন সবুজের শিহরণ। কোকিলের কণ্ঠে বাজে বসন্তেরই গান। দিগন্তের কোল ঘেঁষে ঢেউ তোলে সর্ষে ফুলের হলুদ আঁচল। সূর্যমুখীরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাই, এখনই শ্মশানচারী বুড়ো শিবের ডমরু দ্রিম দ্রিম রবে বেজে ওঠে। সেই ডাকে সাড়া দিতে বেরিয়ে পড়েন গৃহী সন্ন্যাসীরা। সকলে জড়ো হন গাজন তলায়। গাজনতলায় বুড়ো শিবের কাছারি। কটাদিন মুখে রং মেখে, সং সেজে, নেচে-গেয়ে আনন্দে মাতেন ঘরছাড়া গাজন সন্ন্যাসীর দল।

ছেলেবেলায় শোনা বহুশ্রুত ছড়াটির কথা তো সকলেরই জানা। 'আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই'। ছড়াটির মধ্যে গ্রামবাঙ্গলার রূপ ফুটে ওঠে। শিবের গাজন— গ্রাম থেকে 'গা' আর 'জন' মানে জনগণ। দেশ-গাঁয়ের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। গাজন বা চড়কপুজো সাধারণ মানুষের দেশের উৎসব, আপন উৎসব। 'গাজন' কথাটি এসেছে 'গর্জন' শব্দ থেকে। গাজন সন্ন্যাসীরা জোরে জোরে গর্জন করেন। 'দেবাদিদেব মহাদেবের জয়', 'জয় বাবা বুড়ো শিবের জয়', 'ভোলে বাবা শিবের চরণের সেবা লাগে' ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে। শিব ঠাকুরের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয় গ্রামের আকাশ-বাতাস। আর একটি মত হলো— গা' বলতে গ্রামকে বোঝায়। আর 'জন' বলতে বোঝায় জনসাধারণ। গ্রামীণ জনসাধারণের উৎসব। তাই, নাম— 'গাজন'। লোককথায় পৃথিবীকে সূর্যের পত্নীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিবাহ দেওয়াই এই উৎসবের উদ্দেশ্য।

গাজন উৎসবের পেছনে কৃষক-সমাজের একটি সনাতন বিশ্বাস কাজ করে। চৈত্র থেকে বর্ষার প্রারম্ভ পর্যন্ত সূর্য যখন প্রচণ্ড উত্তপ্ত থাকে তখন সূর্যের তেজ প্রশমন ও বৃষ্টি লাভের আশায় অতীতে কোনো এক সময় কৃষিজীবী মানুষেরা এই অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করেছিলেন। গ্রাম্য শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে এর আয়োজন চলে। যারা আগে থেকে কোনো মানত করে এতে অংশগ্রহণ করে তাদের বলা হয় সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যা। তাঁরা হবিষ্যান্ন ভোজন করে এবং

উতুরি (উত্তরীয়) ও একখণ্ড বেত্র ধারণ করে। এভাবে তারা মন্দির প্রাঙ্গণে নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। আবার এদিনই ব্রাহ্মণ দিয়ে হরগৌরী অর্ধনারীশ্বর মূর্তি পূজা করা হয়। গাজন উৎসবের মধ্যে একমাত্র হরগৌরী পূজা ব্রাহ্মণ দিয়ে করা হয়। এছাড়া বাকি সমস্ত পূজাই শৈব সন্ন্যাসীরা করে থাকে। সন্ন্যাসীদের মধ্যে মূল যিনি থাকেন তিনি গুণিন। তাকে গ্রামের ভাষায় 'মাথুমা' বলা হয়। মাথুমা অনেক মন্ত্র-তন্ত্র সাধনার অধিকারী হন। মাথুমা পূজা পরিচালনার মূল দায়িত্বে থাকেন। এছাড়াও এক বা একাধিক সেবায়েত বা জোগাড়ে থাকেন। যারা দেল পূজা বা হাজরা পূজা দেবার সময় ঠায় বসে নেতৃত্ব দেন।

প্রধানত শিব, মনসা ও ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে এই উৎসব পালন করা হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাসে ধর্মের গাজন উৎসব পালিত হয়। তবে চৈত্র মাসে যে গাজন উৎসব পালিত হয়, তার মূল অংশ হলো শিবের উৎসব। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ ধরে বেশ কিছু মানুষ সন্ন্যাস গ্রহণ করে এই গাজন উৎসব পালন করে। আর এটি শেষ হয় চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক পুজোর পরে। স্থানভেদে এই গাজনের বিভিন্ন নাম রয়েছে, যেমন— মালদহে গাজনের নাম 'গম্ভীরা'; জলপাইগুড়িতে 'গমীরা'। গ্রামবাঙ্গলায় প্রধানত দু' রকমের গাজন হয়— এক, শিবের গাজন। দুই, ধর্মের গাজন। জনশ্রুতি হলো, গাজন উৎসবের দিন শিবের সঙ্গে কালীর বিয়ে হয়। আর গাজন সন্ন্যাসীরা হলেন বরপক্ষ।

অন্যদিকে ধর্মের গাজন উৎসবে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মুক্তি দেবীর বিয়ে দেওয়া হয়। গাজন উৎসবের মূল দেবতা হলেন শিবঠাকুর, নীল ও ধর্মরাজ। বিভিন্ন জেলায় গাজনের আলাদা আলাদা নাম শোনা যায়। রাঢ় বাঙ্গলার ধর্মঠাকুরের গাজনকে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা শৈব উৎসবে পরিণত করেন। শিব ক্রমে প্রধান গ্রামদেবতা হয়েছেন বলে ধর্মের গাজনও সহজে শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে। শিবের গাজন অবশ্যই শৈব ভক্ত বা সন্ন্যাসীরা করে থাকেন। পূর্ববঙ্গের বা দক্ষিণবঙ্গের দেল, চড়ক, রাঢ় ভূমির গাজন এবং উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা মূলত শৈব উৎসব। লোকসংস্কৃতিবিদরা গম্ভীরাকে উত্তরবঙ্গের চড়ক বলে উল্লেখ করলেও মালদা জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কোনও কোনও জায়গায় গম্ভীরা বা গমীরা নামে পরিচিত হলেও চড়কপূজা, হাজরা পূজা, দেল, চৈত্র পূজা নামেও পরিচিত।

পূর্ব মেদিনীপুরের সুন্দর গ্রামের গাজন মেলার বয়স দু'শো বছর। ১৮৩২ সালে মহিষাদলের রাজা লক্ষ্মণ প্রসাদ গর্গ বাহাদুর তৈরি করেন মন্দির। সেখানেই জমাটি গাজন উৎসবের আয়োজন। উৎসবে শামিল আশপাশের গ্রামের হাজারখানেক মানুষ। আবার ধর্মমঙ্গল কাব্যে রানি রঞ্জাবতীকে দেখা গেছে যে তিনি নিজের ধর্মকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে গাজন পালন করতেন। আঠারো শতকের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য 'শিব-সংকীর্তন' বা 'শিবায়ন' কাব্যে গাজনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। শিব যেন ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছেন বাঙ্গালি লোকায়ত জীবনের অতি প্রিয় আপনজন। হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণের মানুষজন আর বর্ণহিন্দুদের প্রিয় দেবতা রূপে শিব গ্রামবাঙ্গলার সর্বত্র বিরাজ করছেন।

চৈত্রের গাজন উৎসব প্রসঙ্গে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'গ্রামদেবতা' প্রবন্ধে লিখেছেন, গাজন-সন্ন্যাসীদের 'ভক্ত্যা' বলা হয়। ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল বাউরি সবাই ব্রত গ্রহণের অধিকারী। শ্রেণীভেদে তিন দিন থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত ব্রত পালনের নিয়ম। ব্রতচারীর চিহ্ন কাঁধে উত্তরীয়। আর হাতে বেতের লাঠি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় গাজন উৎসব সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, 'চিৎপুরের বড়ো রাস্তায় মেঘ কল্লে কাদা হয়— ধুলোয় ধুলো, তার মধ্যে ঢাকের গটরার সঙ্গে গাজন বেরিয়েচে। প্রথমে দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশ বেঁধে কাঁধে করেচে কতগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে, তার পেছনে এলোমেলো নিশেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দল বেঁধে ঢোলের সঙ্গতে 'ভোলা বোম ভোলা বড় রঙ্গিলা, লেংটা ত্রিপুরারি শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা', ভজন গাইতে গাইতে চলেছে। তার পেছনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরোয়ান, হরকরা সেপাই। মধ্যে সর্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি-মাখা টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায়, শিব ও পার্বতী-সাজা সং।'

এশিয়াটিক সোসাইটির নেটিভ সেক্রেটারি রামকমল সেন ১৮২৯ সালের এক বিবরণে লিখেছেন, সন্ন্যাসীরা শিবলিঙ্গের সামনে রাখা একসারি ছুরি অথবা ধারালো বঁটির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একে 'হাটসন্ন্যাস' বা 'ঘাটসন্ন্যাস' বলে। কারণ ঝাঁপের জন্য যে বাঁশের মাচা বাঁধা হতো, তা হাটের মাঝখানে অথবা নদীর ঘাটের ধারে। শিবভক্তির নামে এসব দুঃসাহসিক অনুষ্ঠান তাদের পক্ষে করা সম্ভব হতো।

নদীয়া জেলার শান্তিপুরের জলেশ্বর শিবের গাজন উপলক্ষ্যে একশো বছরের পুরনো মেলা বসে। তারকেশ্বর ধামেও গাজনের মেলা বসে। এছাড়াও বাঁকুড়া জেলার খামারবেড়ে গ্রামে, বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদের তীরে এক্তেশ্বরের গাজনের মেলা বিখ্যাত। দ্বারকেশ্বর নদের তীরে অবস্থিত 'এক্তেশ্বর'। মহাদেবের মন্দিরের জন্যই এই জায়গা বিখ্যাত। শতাব্দী প্রাচীন বাঁকুড়ার এই শিবমন্দির। প্রতি বছর এই গাজনের সময় এখানে বিরাট মেলা বসে। এই সময়ে ভক্তদের সমাগমে তিল ধারণের জায়গা থাকে না। উৎসব ঘিরে সরগরম হয়ে ওঠে গোটা অঞ্চল। এক্তেশ্বর গাজন 'চৈত্র মাস'-এর শেষ দিনে পালিত হয়। মানুষেরা এখানে খুব উৎসাহ এবং আনন্দের সঙ্গে চড়ক পূজা উদ্‌যাপন করে। মেলায় শিশুদের জন্য পুতুল, খাবার, মিষ্টি, স্থানীয় হস্তশিল্পের নিদর্শন এবং চড়কের বিভিন্ন স্টল বসে। এখানে গাজনের ১৫ দিন আগে থেকে শিবের ভক্তরা জড়ো হয়ে যান। স্থানীয় মানুষদের মতে এই গাজন ছশো বছরেরও বেশি পুরনো। হুগলীর চণ্ডীপুর গ্রাম-সহ আরও একাধিক স্থানে শিবের গাজন ও চড়কের জন্য বিশেষ মেলা বসে।

গাজনের গান, নীলের গান, গম্ভীরা গান, সং সাজা, সং যাত্রা প্রভৃতি বিষয়গুলো চড়ক ও গাজন উৎসবের অঙ্গ। শিব-পার্বতীর স্তুতি/বন্দনা, দেহতত্ত্বের সংগীত, দাম্পত্যকেন্দ্রিক হাস্যরসাত্মক গান, মাদক সেবন এবং দলীয় রাজনীতি বিষয়ক গান, হাসির গান, কৃষির গান ইত্যাদি শুনতে পাওয়া যায় গাজনের মেলায়।

এক সময় কালীঘাট ছিল চড়ক উৎসবের

মূল কেন্দ্র। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গাজন সন্ন্যাসীরা ভোরবেলাতেই চলে যেতেন কালীঘাটে। সং সেজে হাতে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান গাইতে গাইতে তাঁরা আসতেন। কালীঘাটে শরীরে বাণ ফুঁড়ে গাজনের দল বেরিয়ে পড়তেন শহরের পথে পথে। কলকাতায় গাজন উৎসবে এককালে কাঁসারিপাড়া ও জেলেপাড়ার সং বিখ্যাত ছিল।

গাজন নিয়ে একটা অদ্ভুত গল্প আছে। বলা হয়, নবাব আলিবর্দি খাঁ নাকি একবার গাজন দেখতে এসেছিলেন অম্বুলিঙ্গ শিবের মন্দিরে। নিজের বর্শা মাটিতে পুঁতে দিয়ে তার ওপর ঝাঁপ দিয়ে ভক্তির পরীক্ষা দিতে বললেন কৃষ্ণগিরিকে। তৎক্ষণাৎ তার ওপর ঝাঁপাতে বর্শা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এরপর কৃষ্ণগিরিকে তিনি আশি বিঘা জমি দান করেন।

বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ে ধর্মরাজ ঠাকুরের গাজনে তিনটি প্রমাণ সাইজের কাঠের ঘোড়ার ওপরে মহমানস, স্বরূপনারায়ণ ও ধর্মরাজ (যথাক্রমে বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম)-কে চড়িয়ে অসংখ্য ভক্ত-সন্ন্যাসী এবং মাথায় জ্বলন্ত ধুনোর খোলা নিয়ে ব্রতচারিণী দলের শোভাযাত্রা বেরোয়। ঠাকুরের বার্ষিক পুজো উপলক্ষ্যে ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উপলক্ষ্যে কোনো কোনো গ্রামে যে চড়ক হয়ে থাকে, তার সঙ্গে ধর্ম পুজোর মৌলিক সম্পর্ক আছে বলেই মনে করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কপুজোর উৎসবের সঙ্গে শিবের গাজন শেষ হয়। আর ধর্মের গাজন অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমায়। অনেক সময় জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় পূর্ণিমায় ধর্মের গাজন হয়।

শিবের গাজন ও ধর্মের গাজনের সঙ্গে অনেক মিল পাওয়া যায়। তবে ধর্মের গাজনে যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান, নাচ, গানের আয়োজন করা হয় তা বিচার করলে বোঝা যায় ধর্মপুজো তথাকথিত নিম্নবর্গীয়দের সৃষ্টি। আর ধর্মঠাকুর হলেন তাদের দেবতা। তবে, বর্তমানে শিবের গাজনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমশ বাড়তে থাকায় ধর্মঠাকুরের পুজো অনেকখানি ম্লান হয়ে পড়েছে।

চৈত্রমাস ছাড়া যদি অন্য সময়ে শিবের গাজন উৎসবটি পালন করা হয় তবে তার একটি অদ্ভুত নাম আছে, তাকে 'হুজুগে গাজন' বলে ডাকা হয়। গাজন উৎসব তিনদিন ধরে চলে এবং এই উৎসবের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম মেলাও বসে।

গাজন উৎসব মূলত তিনটি অংশে বিভক্ত। ঘাট-সন্ন্যাস, নীলব্রত ও চড়ক। প্রথা মেনে দীর্ঘদিন উপবাসের পর প্রথমে শিবের পুজোর ফুল সংগ্রহ করে প্রতীকী শিবলিঙ্গকে মাথায় করে ঢাক-ঢোল, কাঁসর বাজিয়ে পরিক্রমায় বের হয় ভক্ত সন্ন্যাসীরা। গাজনের ভক্তরা তাদের শরীরকে বিভিন্ন উপায়ে যন্ত্রণা দিয়ে কৃচ্ছসাধন করে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য শোভাযাত্রা সহকারে মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হয়। অঞ্চলভেদে গাজনের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন— মুখোশ নৃত্য, সং-সাজা, শিব ও গৌরীর বেশ ধারণ, দৈত্য-দানব সেজে নৃত্য করা প্রভৃতির প্রচলন রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন লৌকিক ছড়া ও আবৃত্তি গানের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান চলতে থাকে। ধর্মের গাজনের বিশেষ অঙ্গ হলো নরমুণ্ড বা মড়া খেলা, যা কালিকা-পাতারি নাচ নামে পরিচিত। জ্যৈষ্ঠ মাসে পালিত হওয়া মনসার গাজনে মহিলারা অংশ নেন। কালী সেজে মুখোশ পরে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। পৌরাণিক নানা চরিত্রের বেশ ধরে শরীরের নানা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে এই উৎসব পালন করা হয়।

মহারাষ্ট্রের 'বগাড়' উৎসব, অন্ধ্রপ্রদেশের 'সিরিমনু' উৎসব কিংবা মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত

প্রাচীন 'ড্যান্সা ডে লো ভোলাডোরস' উৎসব বাঙ্গলার গাজন উৎসবের চড়ক পূজার অনুরূপ। চড়ক গাজন উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ। এই উপলক্ষ্যে এক গ্রামের শিবতলা থেকে শোভাযাত্রা বের করে গ্রামান্তরের শিবতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। একজন শিব ও একজন গৌরী সেজে নৃত্য করে। অন্যান্য ভক্তরা নন্দী-ভৃঙ্গী, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব প্রভৃতি সেজে শিব-গৌরীর সঙ্গে সঙ্গে নাচে। এ সময় শিব সম্পর্কে নানা রকম লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করা হয়। যাতে শিবের নিদ্রাভঙ্গ থেকে শুরু করে তাঁর বিয়ে, কৃষিকর্ম ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ থাকে। এই অনুষ্ঠান সাধারণত তিন দিনব্যাপী চলে। চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উপলক্ষ্যে কোথাও কোথাও কালীনাচ হয়। অসুরবধ উপলক্ষ্যে কালীর নৃত্য একটি বিষয়। এটি বাঙ্গলার লোকনৃত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। চড়ক অনুষ্ঠানটি আসলে সূর্য পুজো। যে দিনটিতে চড়ক অনুষ্ঠিত হয়, সূর্য সেই দিন দ্বাদশ রাশির পথে ভ্রমণ শেষ করে নতুন যাত্রা শুরু করে। চড়কগাছ ও চড়কের চাকা স্পষ্টই সূর্যের আবর্তন ও চক্রাকারে ভ্রমণের দ্যোতক। চৈত্র মাসের শেষ দিন থেকে বৈশাখ মাসের মাসের প্রথম দু-তিন দিন চলে এই চড়ক মেলা। এটি চড়ক সংক্রান্তির মেলা হিসেবেও পরিচিত। কথিত আছে, এই দিনে শিব-উপাসক বানরাজা দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মহাদেবের উপাসনা করেন। দেবাদিদেব মহাদেবকে তুষ্ট করে অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় ভক্তিসূচক নৃত্যগীতাদি ও নিজ রক্ত দিয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। সেই স্মৃতিতে শৈব সম্প্রদায় এই দিনে শিব প্রীতির জন্য উৎসব করে থাকেন।

পূর্বে পাশুপত সম্প্রদায়রা এই উৎসব পালন করতেন। জনশ্রুতি রয়েছে, ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরানন্দ ঠাকুর নামের এক রাজা এই চড়ক পুজোর প্রচলন শুরু করেন। গম্ভীরাপুজো বা শিবের গাজন এই চড়কেরই রকমফের। এই পূজারই বিশেষ এক অঙ্গ যার নাম নীলপুজো। তবে, রাজবাড়ির থেকে এই পুজোর প্রচলন হলেও রাজাদের এই পুজোয় খুব একটা বেশি অংশীদারি ছিল না। তাই এই পুজোর কখনও কোনও ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়নি।

ঐতিহাসিকদের মতে, মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তলানিতে এসে পড়লে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা নানা স্থানে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করেন। তাঁদের একজন বঙ্গ দেশে এসে হিন্দুধর্মে পরাবর্তিত হন। তাঁর সঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান, কৃচ্ছ্র সাধনা ও সংসারের ভোগবিলাসের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য হিন্দুদের আচরণ বিধির অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এই কারণেই ধর্মঠাকুরের গাজন ক্রমে ক্রমে শিবের গাজনে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ধর্মঠাকুরের পূজারিরা হলেন সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ যথা— দুলে, বাউরি, বাগদি, ডোম সম্প্রদায়ের মানুষজন। ধর্মঠাকুরের কোনও বিগ্রহ নেই। একটা আকারবিহীন প্রস্তর খণ্ডকে সিঁদুর মাখিয়ে ধর্মঠাকুর বলে পুজো করা হয়। সাধারণত ধর্মঠাকুরের কোনও মন্দির নির্মাণ করা হয় না। খোলা মাঠ বা গাছের তলায় প্রস্তর খণ্ডটিকে স্থাপন করা হয়। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ধর্মঠাকুরের পুজো হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের মানুষরা ধর্মঠাকুরের পুজো করেন। ধর্মঠাকুরের বাহন হলো টেরাকোটার ঘোড়া, আবার অনেক বুদ্ধমূর্তিকেও ধর্মঠাকুর বলে মানেন।

চড়ক পুজোর অপর নাম নীলপুজো। এই পুজোর মূল উদ্দেশ্য, হলো ভূত-প্রেত এবং পুনর্জন্মবাদের উপর বিশ্বাস। চৈত্র সংক্রান্তির ৭ দিন আগে দুধ, মধু, ঘি, তেল দিয়ে শিবকে স্নান করানো হয় এবং সেটি নিয়ে গ্রামে গ্রামে বেরিয়ে পড়া হয়। পুজোর আগের দিন চড়কগাছটিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়। এরপর একটি জলভরা পাত্রে শিবের প্রতীক সিঁদুর মাখা লম্বা কাঠের তক্তা যাকে বলা হয় শিবের পাটা, সেটিও রাখা হয়, যা পূজারিদের কাছে 'বুড়োশিব' নামে পরিচিত। ফুল, ফল ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় এই চড়কের দিন সন্ন্যাসীরা শিবকে প্রণাম জানান।

মূলত কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলিতে চড়ক উৎসব বেশি করে পালিত হয়। চড়ক পুজোর অঙ্গ হলো— কুমিরের পুজো, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর হাঁটা, কাঁটা ও ছুরির উপর লাফানো, বাণফোঁড়া, শিবের বিয়ে, অগ্নি নৃত্য, চড়কগাছে দোলা, দানো-বারানো পুজো। চড়ক গাছে ভক্ত- সন্ন্যাসীদের লোহার হুড়কো দিয়ে চাকার সঙ্গে বেঁধে দ্রুতবেগে ঘোরানো হয়। তাদের মতে বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্রের মাধ্যমে এই বর্শি বিধানো হয়, যার ফলে এই সমস্ত কাজকর্মের সঙ্গে লিপ্ত থাকা কোনো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এছাড়াও পিঠে, হাতে, পায়ে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে শলাকা বিদ্ধ করা হয়। চড়ক পুজোর কিছুদিন আগের থেকে সন্ন্যাসীরা ব্রত ও সংযম পালন করে। গিরি সন্ন্যাস, হাজরা পুজো, বাবর সন্ন্যাস, নীলচণ্ডীকার ইত্যাদি নানা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে চড়ক পুজো পালন করা হয়।

শিবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য এই সন্ন্যাসীরা ধারালো বঁটি, গাছের কাঁটার উপর ঝাঁপ দেন। জ্বলন্ত শলাকা গায়ে ধারণ করেন। ৪/৫ ইঞ্চির একটি লৌহ শলাকা সারাদিন জিভে গেঁথে রেখে পুকুরে গিয়ে সেটি খুলে ফেলে দেয়। একে বলে 'বাণ সন্ন্যাস'। এই সমস্ত প্রথার মাধ্যমে এই চড়ক পুজো সম্পন্ন করা হয়। পিঠের দু'দিকে চামড়া ভেদ করে শরীরে বেত ঢুকিয়ে 'বেত্র সন্ন্যাস' পালন করা হয়। মাঠের মাঝখানে চড়কগাছটি স্থাপন করা এবং সেই গাছটিকে কেন্দ্র করে কাষ্ঠখণ্ড বেঁধে তাতে সন্ন্যাসীরা শূন্যে বনবন করে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকেন। ভক্তরা প্রবল বেগে ঘুরতে থাকায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যায় এবং একে দেবতার ভর ওঠা বলা হয়। এই সব পুজোর মূলে রয়েছে ভূতপ্রেত ও পুনর্জন্মের ওপর বিশ্বাস। এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রাচীন কৌমসমাজে নরবলিও প্রচলিত ছিল। পুজোর উৎসবে বহু প্রকারের দৈহিক যন্ত্রণা আনুষ্ঠানের অঙ্গ বলে বিবেচিত হতো।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার আইন করে এ নিয়ম বন্ধ করে। ছোটোলাট বিডন সাহেব এই প্রথা রোধ করেছিলেন। কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে আজও তা প্রচলিত। আর উত্তর কলকাতার ছাতুবাবু, লাটুবাবুদের চড়কের কথা বিদগ্ধ মানুষমাত্রই জানেন।

মোটামুটিভাবে যে সমস্ত জায়গায় গাজন উৎসব পালন হয়, সেই সমস্ত জায়গাতেই চড়কও পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাঙ্গলা-সহ বাংলাদেশেও চড়ক উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন জায়গায় চড়কপূজা হলেও জৌলুস কিছুটা কমেছে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে ততটা উন্মাদনা দেখা যায় না। টেলিভিশন, ওটিটি প্রযুক্তির দাপটে এই উৎসবের জনপ্রিয়তা কমতে বসেছে। ▯

জীবনের রঙে রাঙানো এক আলেখ্য

নিখিল চিত্রকর

চলার পথের শেষ নেই। এ পথ আদি-অন্তহীন। একসময় কর্মসূত্রে পথে পথে পরিক্রমা করতেন লেখক সন্দীপ চক্রবর্তী। মানুষকে জানার তীব্র টানে তিনি ভেসেছেন উজানের স্রোতে। এই পথেরই এক বাঁকে সাবেক বাড়ির ঝুল বারান্দা। তার নীচে দাঁড়িয়ে লেখকের চোখ চলে যায় সেই ধুলোমাখা বীথিকায়। যেখানে মানুষ, মানুষের মন, কষ্ট, কান্না ঢাকা পড়ে আছে দৈনন্দিন 'আমিত্বে'র বিজ্ঞাপনে। সন্দীপ চক্রবর্তীর উপন্যাসের শুরু এখান থেকেই। যে পথের প্রথম গন্তব্য নবদ্বীপ। নিতাই ঠাকুরের আশ্রম। যে নিতাই ঠাকুর কর্মজীবনে ব্যাঙ্কের চাকুরে ছিলেন। অবসরের পর কলকাতার পাট চুকিয়ে চলে আসেন পৈতৃক ভিটে নবদ্বীপে। চৈতন্যদেবের মন্দির গড়ে প্রতিষ্ঠা করেন আশ্রম। ছায়া সুনিবিড় সেখানেই লেখকের পরম প্রশান্তি। এই কাহিনির কথক লেখক সন্দীপ চক্রবর্তী নিজেই। তাঁকে ঘিরেই সমস্ত চরিত্রের আনাগোনা। অবশ্যই সেসব চরিত্রের সমাবেশে স্বতন্ত্র চরিত্র মোহর। মৌরিপুরের বসন্ত কবিরাজের মেয়ে। অকালে স্বামী- সন্তান হারিয়ে সমাজের চোখে আজ অপাঙ্‌ক্তেয়। একদিকে প্রিয়জন বিয়োগের শোক, অন্যদিকে সমাজের আচার সংবলিত কুসংস্কার— দুইয়ের চাপে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে সে। বসন্ত কবিরাজের কুলগুরু রামকিশোর ভট্টাচার্যের কথায় যে মেয়ে অকালে স্বামী- সন্তানকে হারায় সে সাক্ষাৎ বিষকন্যা। গঞ্জনা আর ভর্ৎসনা কণ্ঠরুদ্ধ করে মোহরের। জীবন তাঁর কাছে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বহু চরিত্রের চিত্রায়ণের মাঝেও লেখকের মানসপটে বারবার ফুটে উঠেছে মোহরের অস্তিত্ব। বসন্ত কবিরাজ লেখকের কাছেই নিবেদন রেখেছেন মোহরকে আলোয় ফেরানোর। উপন্যাসের অগ্রগতিতে দেখা যায় লেখকের মর্মস্পর্শী তৎপরতায় আলোকিত হয় মোহরের জীবন। ধর্মীয় গোঁড়ামির বেড়াজাল ভেঙে আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পায় মোহর।

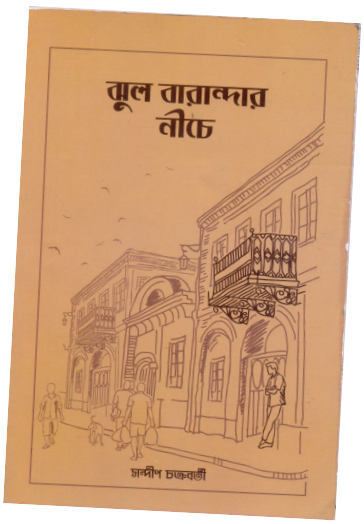

তাঁর মতোই আর এক মানবীর চিত্র ফুটে উঠেছে। দুলারি। উত্তরপ্রদেশের চুনারে বসবাসরত দুলারি অল্পবয়সে পরিজনদের হারিয়ে যখন জীবনে বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায় না, সেইসময় মন্দিরের পুরোহিত তাঁকে ভার দেন বিগ্রহ গোপালের নিত্যসেবার। ছোট্ট লাল্লার মধ্যে নিজের সন্তানকে খুঁজে পায় সে।

এই হাটসেরান্দি গ্রামেরই ডাক্তার দয়াশঙ্কর হালদার। তাঁর স্ত্রী অতসী শৈশবেই পিতৃহারা হন। বাবার মৃত্যুর জন্য অতসীকেই দায়ী করেন তার ঠাকুমা চন্দ্রা। শিশুমনের বিপর্যয় ও অস্বাভাবিকতা তখন থেকেই শুরু। অতসীর মনের অসুখ সারাতে তৎপর হন দয়াশঙ্কর ডাক্তার। হাটসেরান্দির পথে চলতে গিয়েই রসিক, নরুন, খুকুমণি, কানামাছি, সুবল চরিত্রগুলোর সমাবেশ। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাগ কাটে বালিকা খুকুমণি। শরীরে তার মারণরোগের বাসা। তার মেয়েপুতুলের জন্য মেলায় গিয়ে একটা ছেলেপুতুল কিনবে সে। আর শুনবে গাংশালিখের ডাক। দৃষ্টিহীন হরবোলা কানামাছি গাংশালিখের ডাক নকল করতে সমুদ্রের উদ্দেশে পাড়ি দেয়। মৃত্যুপথ যাত্রী হংসবালিকা খুকুমণির বাসনা পূর্ণ হয়। লেখকের আর এক পরমাত্মীয় হাটসেরান্দির ঈশ্বর পোটো। রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে তাঁর আঁকা পট ও ছবি দেশে- বিদেশে সমাদৃত। তাঁর মেয়ে পুতুল আর্ট কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে বাবার পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তাই 'স্পিরিচুয়াল লাইফ' দেখতে লেখকের সঙ্গে ভারতের পথে পথে ঘোরার ইচ্ছাপ্রকাশ করে সে। এভাবে বহু চরিত্র, বহু বিভাব নিয়ে একের পর এক দৃশ্য এঁকেছেন লেখক সন্দীপ। আবেগের সেতুবন্ধন করে বিপরীত মনে জায়গা করে নিয়েছেন। তবু একাকার হননি। তাঁর কবিতার ছত্র উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'একের সঙ্গে এক যোগ করে দেখেছি/ দুই হয়ে যায়/ একাকার হয় না কখনো।' তাই চিৎপুরের যাত্রাপাড়ার স্টার ছবিরানির প্রেমের প্রস্তাবে বিচলিত হন না লেখক। কারণ মানুষকে জানার অভীপ্সা নিয়ে তাঁর পথে নামা। সহাবস্থানে তিনি অনভিপ্রেত। তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন, "খুব কাছে আমি যাই না কারোর কখনো।"

বন্ধু রজতের যাত্রাদলের সঙ্গে সফরে গিয়ে লেখকের পরিচয় হয় অভিনেতা সদাশিব নন্দীর সঙ্গে। লেখকের বিশ্লেষণে তিনি 'মেজাজি-মজলিসি' এবং 'রাজসিক'। বারো বছর বয়সে পালাগানের টানে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান তিনি। যাত্রাদলের তখনকার নামকরা অভিনেত্রী মিনতি গায়েনের সুনজরে পড়ে অভিনয়ে হাত পাকান সদাশিব। নায়িকা লিপিকা ঘোষের সঙ্গে জুটি বেঁধে একসময় দাপিয়ে বেড়িয়েছিলেন যাত্রা জগতে। সময়ের ফেরে আজ তিনি পার্শ্ব চরিত্র মাত্র। যাত্রাদলের কুশীলবদের নিয়ে পরের উপন্যাস লিখতে চান লেখক। তার খানিকটা আভাস এখানেই পাওয়া যায়।

সন্দীপ চক্রবর্তীর 'ঝুল বারান্দার নীচে' পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝেই বিভূতিভূষণের আরণ্যক উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। বহু বছর পরে বাংলা সাহিত্যকে এমন একটি জীবন আলেখ্য উপহার দিলেন সন্দীপ। মানুষের জীবন কথা,সংসার যাপন, ভাব-আবেগের বিচিত্র সম্ভারে ভরে উঠেছে লেখকের ঝুলি। রূপক অর্থে তাই হলো ঝুল বারান্দা। বেশ সাদামাটা অথচ অর্থের ভারিক্কিতে পূর্ণ প্রচ্ছদ। আজকের দিনে মানুষ যখন ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে, সেই সময়ে সন্দীপ চক্রবর্তীর এই উপন্যাস পাঠককে সমাজজীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধুর্যগুলিকে শ্রদ্ধা করতে উৎসাহিত করবে।

পুস্তকের নাম ঃ ঝুল বারান্দার নীচে।
লেখক ঃ সন্দীপ চক্রবর্তী।
প্রকাশক ঃ উর্বী প্রকাশন। মূল্য ঃ ৩০০ টাকা।

পিচকারি

— মা, এবারে আমাকে একটা বড়ো দেখে পিচকারি কিনে দেবে তো?

—হ্যাঁ দেবো।

সেই আগেরবার যেমন সুন্দর দেখে কিনে দিয়েছিলে ওইরকমই দিও কিন্তু।

—গতবারে অত ভালো পিচকারিটা তোর বাবা কিনে দিল। তুই তো আগের দিনই সেটা ভেঙে ফেললি। তারপর তুই বোনেরটাও কোথায় হারিয়ে এলি। বাবা বকাবকি করছিল মনে নেই?

— সে তো মনে আছে। বোনেরটা পচা ছিল। কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে!। ওসব জানি না, তুমি আমায় কবে পিচকারি কিনে দেবে বলো?

— আচ্ছা দেবো, কিন্তু এখন তো দোলের সময় নয়।

শহরের অটোরিকশায় বসে মা ও ছেলে কথা বলতে বলতে স্কুলের পথে চলেছে। ক্লাস থ্রিতে পড়ে বটাই। ভালো নাম বটকৃষ্ণ। বাপী ও লতার প্রথম সন্তান বটাই। অনেক পুজো ও মানত করে শেষে বটাইয়ের জন্ম। তারপর বেশ ক'বছর পর আসে বোন মামন। বটাইয়ের বাবা বাপী নস্কর স্থানীয় গেঞ্জি কারখানায় কাজ করে। মা লতা বাড়িতে ঠোঙা বানায়। ওরা রেলবস্তিতে থাকে। বাপী-লতার সামান্য আয়ে টেনেটুনে সংসার চলে। বটাইয়ের পড়াশোনা, দুই ছেলে-মেয়েকে মানুষ করা, নিত্যদিনের এটা সেটা, অসুখবিসুখ—কুলিয়ে ওঠে না।

বটাইকে নিয়ে লতার খুব চিন্তা। ছোটো থেকেই ওর ভীষণ বায়নাক্কা। সব সময় এটা দাও, ওটা চাই। পড়াশোনাটা ভালো করে। নিজেরা পড়াশোনা খুব একটা জানে না। বটাই নিজেই সব পড়ে। সেদিন স্কুলের মালতী দিদিমণি ডেকে বললেন, ' ছেলের মাথা খুব ভালো, একটু যত্ন নিও।' গরিবের সংসারে আর আলাদা করে কীসেরই-বা যত্ন। কোনোরকমে চারটি পেট চলে। করোনার সময় লকডাউনে কারখানা বন্ধ ছিল বাপীর। লতারও ঠোঙার অর্ডার ছিল

না। গত বছর দোলের সময় বায়না ধরেছিল পিচকারি কিনে দেওয়ার। তখন তো দারুণ অভাব। ওসব সৌখিনতা কী দিয়ে হবে! অনেক বোঝাবার পরও যখন শুনলো না, কেঁদেকেটে ভাসালো, তখন চেয়েচিন্তে পিচকারি কিনে দিয়েছিল লতা। এবারে সবেমাত্র কারখানা খুলেছে। হাতে বিশেষ টাকাপয়সা নেই। তারমধ্যেই আবার বায়না ধরেছে এবারেও নতুন পিচাকারি চাই। কোথা থেকে আসবে তার টাকা ভেবেই কুল পাচ্ছে না লতা। বটাইয়ের বাবাকে বলতেও তার খারাপ লাগছে। উদয়াস্ত খেটে সপ্তাহের শেষে কটামাত্র টাকা এনে সে লতার হাতে তুলে দেয়। তাই দিয়ে এক সপ্তাহ চালাতে হয় গোটা সংসার। বটাইয়ের বাবার মন মেজাজও ভালো নেই ইদানীং। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লতা।

দোলের আগের রাতে ছেলে-মেয়েকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে নিজেরাও খেয়ে নিল। ওদিকে বোন ঘুমিয়ে পড়লেও বটাইয়ের চোখে ঘুম নেই। মা বলেছে বাবাকে রাতে বলবে পিচকারি কিনে দেবার কথা। ছোট্টো খাটের একপাশে শুয়ে সে কান খাড়া করে শুনতে থাকল বাবার মা'র কথা। মা বলল, কাল দোল। ছেলেটা কান্নাকাটি করছে পিচকারি কিনে দেবার। বস্তির সব ছেলেরাই কিনবে। মাকে থামিয়ে বাবা বলল, কোথা থেকে পয়সা আসবে শুনি? আবার যদি লকডাউন হয় তবে না খেয়ে মরতে হবে। ছেলেকে বেশি আশকারা দিও না। চুপ করে রইল মা। তারপর আঁচলের খুঁট খুলে কটা টাকা বাবার হাতে দিয়ে বলল, কানের রুপোর দুলদুটো বন্ধক রেখে কটা টাকা পেলাম। এটা দিয়ে বটাইয়ের পিচকারি কিনে এনো। বাবা কান্নাভরা গলায় বলল, আর কতদিন এভাবে চলবে লতা? মা চুপ করে রইল। চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল।

সারারাত আর ঘুম আসেনি বটাইয়ের। ভোরের আলো কখন ফুটবে তার অপেক্ষায় ছটফট করছে। বাবা খুব ভোরে ওঠে। পালবাবুদের গাড়ি ধুতে যায়। বাবা বেরিয়ে যেতেই মায়ের কাছে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল বটাই। কান্নাভেজা গলায় বলল তুমি আমার খুব ভালো মা। জানো তো স্কুলের অনেক বন্ধুই কিন্তু পিচকারি কেনে না। ওই যে শ্যামল ওর হাত ফুলে গেছিল গতবারে। আরও কত কী হয়। তাই আমিও ঠিক করেছি পিচকারি কিনবো না। বাবাকে বলো আমার পিচকারি চাই না। আর হ্যাঁ, আবির আর রং আনতে বলো কিন্তু। আমি হাতে আবির নিয়ে সবার আগে তোমার আর বাবার পায়ে দিয়ে প্রণাম করবো। তারপর বোনকে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে রং খেলবো। ছেলের কথা শুনে লতা অবাক হয়ে গেল। ছেলের আমার হলো কী! রাধামাধব বোধহয় ছেলের সুমতি ফিরিয়ে দিলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে জোড়হাতে প্রণাম করলো লতা।

@নিচি

ভারতের বিপ্লবী

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জন্ম ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ৫ মে। তিনি ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রথম মহিলা বলিদানী। ছাত্রীজীবনে ঢাকার দীপালী সঙ্ঘ এবং কলকাতার ছাত্রী সঙ্ঘের উৎসাহী কর্মী ছিলেন। ঢাকা বোর্ডের আইএ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করে চট্টগ্রামে শিক্ষকতা শুরু করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর তিনি প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক কাজের ভার পান। পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে নেত্রী নির্বাচিত হয়ে একদল যুবক নিয়ে ক্লাব আক্রমণ করে একজনকে নিহত ও একজনতে আহত করে অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হন। তারপর তিনি দেশের লোকের কাছে আত্মদানের আহ্বান রেখে পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। সেদিনটা ছিল ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর।

জানো কি?

- মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান নদ-নদী হলো ভাগীরথী, ময়ূরাক্ষী,দ্বারকা, জলঙ্গী। ধুলিয়ানে গঙ্গানদী পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং ভাগীরথী নামে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলেছে।
- জেলায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ সালে। সম্পাদক ছিলেন গুরুদয়াল চৌধুরী।
- ঐতিহাসিক লালদিঘির নাম বর্তমানে সুভাষ সরোবর।
- জেলার সদর শহর বহরমপুরের প্রাচীন নাম ব্রহ্মপুর

ভালো কথা

দোলের আনন্দ

এবার দোলের দিন সকালে আমরা আমাদের শাখার মাঠে সবাই মিলে আবির খেলে পাড়ায় বের হলাম। রাস্তার দুপাশে দোকানে, বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে বড়োদের পায়ে আবির দিলাম। কোনো কোনো বাড়ির লোকেরা আমাদের দেখেই দরজায় এগিয়ে আসছিল। আমরা আবির দিয়ে প্রণাম করতেই আমাদের সবাইকে মিষ্টি বা চকোলেট দিচ্ছিল। ঘুরতে ঘুরতে আমরা স্বামীজীর বাড়ি গেলাম। স্বামীজী মহারাজের পায়ে আবির দিয়ে আমরা প্রণাম করলাম। তিনি খুব খুশি হয়ে আমাদের আশীর্বাদ করলেন। আমাদের সঙ্গে দাদারাও ছিল। তিন ঘণ্টা আমরা ঘুরেছিলাম। খুব আনন্দ হয়েছিল।

অভিজিৎ দাঁ, সপ্তম শ্রেণী, টিপি রোড, কলকাতা-৬

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ন ণ্ডা ধ র	(১) ণ বে র ভা তা ষ
(২) ব বা ন দি	(২) ল ট লা লি ন খ

২১ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) প্রাণনাশক (২) বঙ্গললনা

২১ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) হৃদয়বিদারক (২) হোমরাচোমরা

উত্তরদাতার নাম

(১) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, মকদুমপুর, মালদা। (২) সোহিনী মণ্ডল, দহিয়া, বলাগড়, হুগলী (৩) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (৪) প্রিয়া হালদার, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

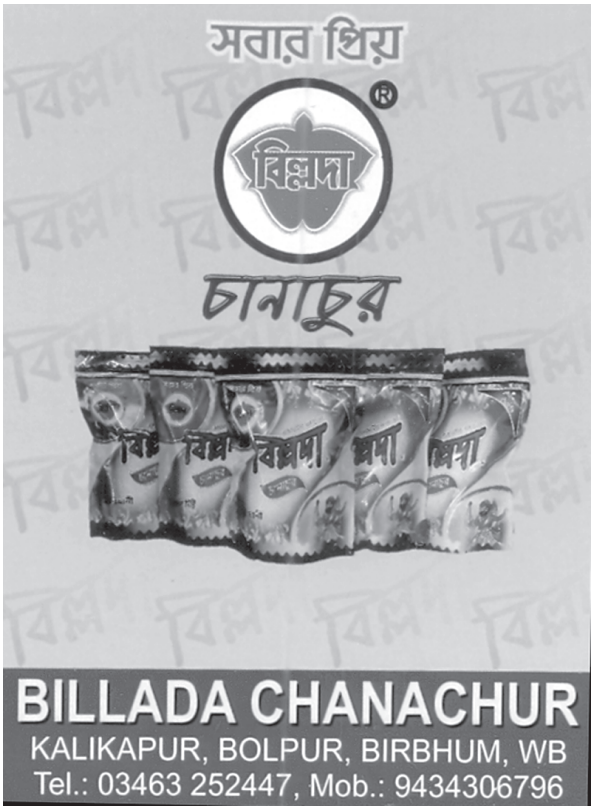

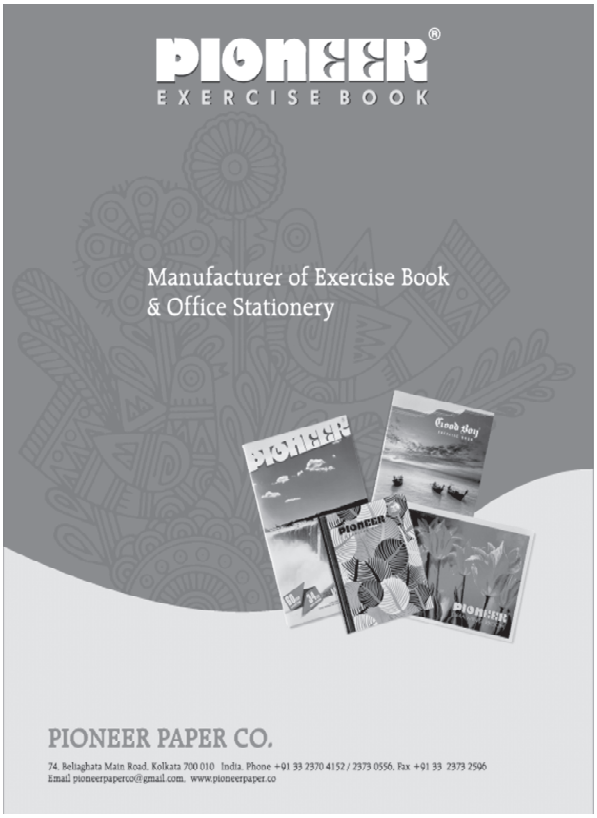

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

নরেন্দ্র মোদী ভারতের মানুষের হৃদয় জয় করেছেন

রামানুজ গোস্বামী

বিজেপি বিরোধী দলগুলির বক্তব্য হলো মোদী ম্যাজিক আর নেই। তা একেবারে উবে গিয়েছে। এই সব কথা কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া একাধিক রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে একেবারে সলিলসমাধি লাভ করেছে। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে চার রাজ্যেই বিজেপির বিজয় পতাকা স্বমহিমায় উড্ডীয়মান। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, গোয়া, মণিপুর ও পঞ্জাব— এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ঠিক কোন্‌দিকে, তার একটা আন্দাজ যে অতি অবশ্যই পাওয়া গেল, তা তো বলাই বাহুল্য। এই পাঁচ রাজ্যের মধ্যে চার রাজ্যেই গঠিত হয়েছে বিজেপি সরকার। সব ক্ষেত্রেই বিজেপি বিপুল পরাক্রমে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে বা সর্ববৃহৎ দলের মর্যাদা লাভ করেছে। উলটোদিকে দেশে বিজেপির প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস সমগ্র ভারত থেকেই হারিয়ে যেতে বসেছে। এই নির্বাচনে পঞ্জাবে কংগ্রেস দল শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছে। সেই জায়গার দখল নিয়েছে আম আদমি পার্টি।

আসলে পরিবারতন্ত্র ও দেশবিরোধী বিভিন্ন নীতি এবং সর্বোপরি হিন্দুদের বিপক্ষে গিয়ে নানাভাবে মুসলমান-তোষণই কংগ্রেসের মতো এতো সুপ্রাচীন রাজনৈতিক দলের এই পরিণতির জন্য দায়ী। ফলে পঞ্জাব ছাড়াও গোয়া ও উত্তরাখণ্ডের মতো রাজ্যেও (যেসকল রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করবে বলে আশা করেছিল) কংগ্রেস ধরাশায়ী হয়েছে। আসলে ভারতবাসী এই গান্ধী-নেহরু মতাদর্শ তথা গান্ধী পরিবার দ্বারা পরিচালিত কংগ্রেসকে আর চাইছে না। অথচ কংগ্রেসের নেতারা আত্মসমীক্ষা তো করছেনই না, বরং মোদী বিরোধিতাতেই ব্যস্ত থাকছেন। আর যত বিরোধিতা করছেন, কংগ্রেস বা কংগ্রেসি নেতা-নেত্রীদের প্রতি মানুষের অনাস্থা ততই বেড়ে যাচ্ছে; ফলে কংগ্রেস একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে এবং বিজেপি আরও এগিয়ে চলেছে।

ভারত আজ সারা পৃথিবীর মধ্যে এক ব্যতিক্রমী দেশ, যাকে সমস্ত শক্তিধর দেশই নিজেদের দলে পেতে চায়। কোনো দেশ যা করতে পারেনি তাদের ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিকদের জন্য, ভারতের প্রধানমন্ত্রী তা করে দেখিয়েছেন। তাই তিনি আমাদের গর্বের প্রধানমন্ত্রী।

উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা চিরকালই পালন করে। সর্বাধিক আসনসংখ্যাবিশিষ্ট এই রাজ্য তাই দিল্লির রাজনীতিতে ভীষণ ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে বিগত পাঁচ বছরে উত্তরপ্রদেশে যে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে, যা কিনা প্রধানমন্ত্রীর

ফঃ ৬

প্রকল্পগুলিকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে, এই নির্বাচনী ফলাফল তারই পরিচয় বহন করছে। একচেটিয়া মুসলমান ভোট, টুকড়ে টুকড়ে গ্যাঙের সব রকমের প্রচেষ্টা এবং বিজেপি-বিরোধী মিডিয়াগুলির নানারকম অপপ্রচার সত্ত্বেও বিপুল জনাদেশ পেয়ে যোগীজী দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। সুদীর্ঘ চার দশকের প্রায় কাছাকাছি সময় পরে উত্তরপ্রদেশে ইতিহাস গড়ে কোনো মুখ্যমন্ত্রী দ্বিতীয়বারের জন্য পুনরায় নির্বাচিত হলেন। আসলে, উত্তরপ্রদেশের জনগণ দাঙ্গাকারী, অপরাধীদের সহায়তাকামী ও মুসলমান তোষণকারী দলগুলিকে আর উত্তরপ্রদেশে দেখতেই চায় না। তাই উত্তরপ্রদেশের জনগণ পুনরায় বিপুল ভোটে যোগীজীকেই নির্বাচিত করেছেন। এই যে বিরাট জয়, এতে আবারও প্রমাণিত হলো যে, মোদী ম্যাজিক এখনও অটুট। যোগীজীর পাশে দাঁড়িয়ে স্বয়ং মোদীজী যেভাবে নিজে উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন পরিচালনা করেছেন, তা অনবদ্য। সমাজবাদী পার্টি খুবই আশা করেছিল যে, এবারে বিজেপি থেকে আসা নেতাদের সাহায্যে উত্তরপ্রদেশের জনগণকে ভুল বুঝিয়ে ক্ষমতা দখল করা যাবে। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অখিলেশ যাদবের হয়ে প্রচার করতে উত্তরপ্রদেশে গিয়ে বহুরকম বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঠিক যেমন, তিনি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তথাকথিত তৃণমূলী নেতা-নেত্রীরা গোয়াতে ক্ষমতা দখল এবং তা না হলে অন্তত দারুণ কিছু ফলাফলের আশা করেছিলেন। আসলে এটা বোঝা দরকার যে, উত্তরপ্রদেশ বা গোয়ায় 'দুধেল গাই' দ্বারা ভোট করানো হয় না। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই বাস্তব যে, পশ্চিমবঙ্গের মতো ওইসব রাজ্যে কিন্তু সস্তায় মদ কিংবা ৫০০ টাকা ভিক্ষাভাতা অথবা একটা সামান্য সাইকেল পাওয়ার জন্য লোকে ভোট দেন না। তাই ৫০০০ টাকা ভিক্ষাভাতা দেওয়ার ঘোষণা সত্ত্বেও তৃণমূল একটা আসনও পায় না--- যদিও কাগজে-কলমে তৃণমূল নাকি একটা সর্বভারতীয় দল।

এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করেন এবং এই রাজ্যের অধিকাংশ স্তাবক গণমাধ্যমগুলি নানাভাবে এটাই বোঝাতে চায় যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একজন সর্বভারতীয় নেত্রী ও সর্বাধিক জনপ্রিয় নেত্রী। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে ঠিক উলটো ফল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা যে পশ্চিমবঙ্গের সীমানার বাইরে কিছুই নেই এবং ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তাই নরেন্দ্র মোদীর বিপক্ষে কেউই নেই আর তৃণমূল তো খড়কুটো হওয়ারও অযোগ্য— পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী ফল নির্বাচন সেটাই প্রমাণ করে দিয়েছে।

উত্তরাখণ্ডেও পুনরায় বিজেপরই জায়জয়কার, যা নিঃসন্দেহে কংগ্রেসকে আবারও বেকায়দায় ফেলে দিল। মণিপুর প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। সেখানেও সরকার গড়েছে বিজেপি। এই চার রাজ্যে এই রকম বিপুল জয়ের পরে বলা যায় যে, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়জয়কার প্রায় নিশ্চিত। নরেন্দ্র মোদীও তাঁর বক্তব্যে যথার্থ ভাবেই উল্লেখ করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তা টুকড়ে-টুকড়ে গ্যাং এবং বিজেপি-বিরোধী মিডিয়াগুলির এখন শোক প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো পথই নেই। আসলে, নিজের কর্মদক্ষতা, দেশকে নেতৃত্বদানের অদ্ভুত ক্ষমতা, করোনা অতিমারী আবহে সুনিপুণ ভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদির কারণে ভারত আজ মোদীময়। আজ তাই গড়ে উঠেছে এক নতুন ভারত যা আগামী সময়ে হয়ে উঠবে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র এবং যার রূপকার হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ তিনি সারা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাষ্ট্রনায়ক। নিঃসন্দেহে তিনি অপ্রতিরোধ্য আর তাই এই বিজেপিকে পরাজিত করা যাবে না। টুকড়ে-টুকড়ে গ্যাং এবং ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের মধ্যে অজেয় তথা অভেদ্য বর্মের মতো বা অলঙ্ঘ্যনীয় পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে আছেন নরেন্দ্র মোদী। ভারত আজ সারা পৃথিবীর মধ্যে এক ব্যতিক্রমী দেশ, যাকে সমস্ত শক্তিধর দেশই নিজেদের দলে পেতে চায়। নরেন্দ্র মোদী আছেন বলেই পরস্পর যুদ্ধরত রাশিয়া ও ইউক্রেনের সেনা ভারতের জাতীয় পতাকা দেখলেই ছাত্র-ছাত্রীদের সসম্মানে পথ ছেড়ে দেয় এবং নিরাপদে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দেয়। কোনো দেশ যা করতে পারেনি তাদের ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিকদের জন্য, একমাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী তা করে দেখিয়েছেন। তাই তিনি আমাদের গর্বের প্রধানমন্ত্রী।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটা কথা বলতেই হয়। আজ ভারতের সমস্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষকে এটা বুঝতেই হবে যে, যতক্ষণ বিজেপি ক্ষমতায় আছে, ততক্ষণই দেশ ও হিন্দুধর্ম সুরক্ষিত। কোনো হিন্দু যতই ক্ষমতাশালী ও ধনশালী হোক না কেন, বিজেপি ব্যতীত অন্য যে কোনো রাজনৈতিক দলের শাসনে যখন-তখন তার পরিণতি হতে পারে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মতো। তাই নিজেদের সুরক্ষা এবং পরবর্তী প্রজন্মের সুরক্ষার কথা ভেবে আবারও সর্বত্র বিজেপির জয়ধ্বজা উড্ডীন করতে হবে। এই সকল রাজ্যের হিন্দুরা একজোট হতে পেরেছেন বলেই আজ তারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন ও নিজেদের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদেরও এটা বোঝা দরকার। ভিক্ষা নয়— প্রয়োজন শিক্ষা, শিল্প ও কর্মসংস্থানের; দরকার হিন্দুত্বের জাগরণের। এর অন্যথা হলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুকে পুনরায় ভিটেছাড়া হওয়া থেকে কেউই বাঁচাতে পারবে না। তাই হিন্দুসমাজের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ।

আগামী সময়ে সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে নির্বাচন। এরপরে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন তো আছেই। আগামী সময়েও নতুন ভারতের রূপকার নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী রূপে তৃতীয়বারের জন্য শপথ গ্রহণ করবেন— এই আশা করাই যায়। □

বাংলাদেশে ক্ষেপণাস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণাগার বানাচ্ছে চীন, উদ্বিগ্ন ভারত

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের উত্তাপ যখন বিশ্বময়, এই কঠিন সময়ে জাপানি সংবাদমাধ্যমের চাঞ্চল্যকর একটি খবর নিয়ে কূটনৈতিক অঙ্গনে অন্তহীন কানাঘুষো। কয়েকদিন ধরে গণমাধ্যমে খবরটি ঘুরপাক খেলেও বাংলাদেশ সরকার এ নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেয়নি। টোকিয়োর প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম 'নিক্কেই এশিয়া'র ওই খবরে বলা হয়, বাংলাদেশে বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র (সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল) রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রস্তুত করছে চীন। কিন্তু দেশের কোথায়, কবে থেকে চীনের মিসাইল মেনটেনেন্স ফেসিলিটি সেট আপের উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়েছে। সে সম্পর্কে প্রতিবেদনে কোনো কিছু বলা হয়নি। তবে চীনা রাষ্ট্রদূত তড়িঘড়ি এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশে ক্ষেপণাস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা তৈরির কথা স্বীকার করেন। কিন্তু উল্লেখ করেন, চীন কোনো ঘাঁটি বানাচ্ছে না।

'নিক্কেই এশিয়া'র কন্ট্রিবিউটিং রাইটার নীতালালের লেখা ওই প্রতিবেদনে এ নিয়ে ভারতের উদ্বেগের বিষয়টি সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদকের দাবি— এ নিয়ে নয়াদিল্লি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তাদের উদ্বেগের বড়ো জায়গা হচ্ছে, বাংলাদেশের মতো ভারতের পুরনো মিত্রদের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক জোরদার করে চীন ওইসব দেশের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলছে। চীনের এই তৎপরতাকে 'বাড়াবাড়ি' হিসেবেই দেখছে ভারত।

নীতালাল লিখেছেন, ২০১১ সালে বাংলাদেশকে যে সারফেস টু এয়ার মিসাইল দিয়েছে, তা রক্ষণাবেক্ষণে চীন এমন ব্যবস্থা তৈরি করছে যাকে 'হাব' হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

আর এটাকে নয়াদিল্লি অ্যালার্ম বেল বা বিপদ ঘণ্টা হিসেবে দেখছে। 'রক্ষণাবেক্ষণ হাব' প্রতিষ্ঠার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই

দেশের মধ্যেকার চুক্তি নিয়ে বেইজিং বা ঢাকা কেউই এখনো মুখ খোলেনি। অর্থাৎ এ বিষয়ে অদ্যাবধি আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি। শুধুমাত্র চীনা রাষ্ট্রদূতের ব্যাখ্যা এসেছে। তবে ঢাকার এক সিনিয়র কূটনীতিক নিক্কেই এশিয়াকে এটা নিশ্চিত করেছেন যে, এ নিয়ে দু' দেশের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। অবশ্য এ সংক্রান্ত একটি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টাও করেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কূটনীতিক।

উল্লেখ্য, বিশেষভাবে ডিজাইন করা এবং ভূমি থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র সারফেস টু এয়ার মিসাইল (স্যাম) যা গ্রাউন্ড টু এয়ার মিসাইল জিটিএএম বা সারফেস টু এয়ার গাইডেড ওয়েইপন (স্যাগউ) নামে পরিচিত। এই ক্ষেপণাস্ত্রকে আধুনিক যুগের বিমান বিধ্বংসী ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়।

নিক্কেই এশিয়ার প্রতিবেদনে বাংলাদেশি কূটনীতিকের বয়ানে বলা হয়, বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা খাতের উন্নয়নের বিষয়টি বেইজিং এবং ঢাকা উভয়ে আড়ালে রাখতে চায়, কারণ চীন এখানে কী করছে তা পশ্চিমি দেশগুলি, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে রেখেছে। তাছাড়া ক্ষেপণাস্ত্র বিষয়ক যে কোনো চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের পর থেকে বেশ জটিল হয়ে গেছে। ওই আগ্রাসন বিশ্বকে এমনভাবে নাড়িয়েছে যে আজ সবাই যে কোনো মূল্যে যুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য আকুতি জানাচ্ছে।

রিপোর্ট বলছে, বাংলাদেশকে প্রদেয় সুবিধায় চীনা কোম্পানি ভ্যানগার্ড অংশীদার, এটি চীনের সামরিক বিনিয়োগ এবং সরবরাহের অংশ। যার মধ্যে রয়েছে যুদ্ধজাহাজ, নৌ-বন্দুক, জাহাজ-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র এবং সারফেস টু এয়ার মিসাইল সিস্টেম। সুইডেন-ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে চীনের সামরিক রপ্তানির ১৭ ভাগ গেছে বাংলাদেশে। যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র গ্রাহকে পরিণত হয়েছে। অবশ্য বরাবরের মতো পাকিস্তান চীনের প্রধানতম অস্ত্র রপ্তানি দেশ হিসেবে রয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের

একজন সিনিয়র কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে নিক্কেই এশিয়াকে বলেন, যদিও বাংলাদেশ নিজেকে ভারতের 'ঘনিষ্ঠ মিত্র' বলে মনে করে, তবে তারা চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও সামরিক সম্পর্ক বজায় রাখতেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

নিক্কেই এশিয়ার রিপোর্টে ওই কর্মকর্তার বয়ানে বলা হয়, ২০০২ সালে দু'পক্ষ একটি প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি সই করে, যার মধ্যে অস্ত্র উৎপাদনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এবং এটি উভয়ের মধ্যেকার প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে আরও গভীর করেছে, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা প্রশিক্ষণের জন্য পিপলস লিবারেশন আর্মি ইনস্টিটিউটেও যাচ্ছেন।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ২০১৬ সালে বাংলাদেশ তার নৌ-শক্তি বাড়াতে চীনের কাছ থেকে ২০৩ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে দুটি সাবমেরিন কিনেছে। চীনের সরবরাহকৃত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, বিশেষত ট্রেইনার এয়ারক্রাফট ও নৌ-ফ্রিগেট পরিচালনা সংক্রান্ত কারিগরি জটিলতা সত্ত্বেও এটি এসেছে। চীনের সরবরাহকৃত এফ-৯০ ক্ষেপণাস্ত্রের প্রযুক্তিগত ত্রুটি নিয়ে গত বছরও বাংলাদেশে বিতর্ক হয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান এবং ব্যাপক সামরিক অংশীদারিত্ব (ভিগোরাস মিলিটারি পার্টনারশিপ) বাড়বে, যা ভারতের জন্য একটি বাড়তি চাপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এ বিষয়ে নয়াদিল্লির জওহরলাল ইউনিভার্সিটির চায়নিজ স্টাডিজের অধ্যাপক ড. শ্রীকান্ত কোন্দাপল্লি বলেন, একটি মিসাইল ফ্যাসিলিটি স্থাপন এবং বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের অন্যান্য মিলিটারি এনগেজমেন্ট ভারতের বিরুদ্ধে চীনের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর মধ্য দিয়ে চীন ভারতকে এক শক্তিশালী সংকেত পাঠাচ্ছে যে, দেশটি এখন চীনের কক্ষপথেই রয়েছে। তিনি আরও বলেন, এটি বাংলাদেশিদের 'সেন্টিমেন্ট'কে প্রভাবিত করবে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চীনপন্থী গোষ্ঠীগুলির উত্থানের মতো অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পুনর্গঠনের দিকে পরিচালিত করবে এবং দেশের অভ্যন্তরে চীনের 'ফুটপ্রিন্ট'কে শক্তিশালী করবে।

কোন্দাপল্লি বলেন, ঢাকা-বেইজিং বন্ধুত্ব ভারতের কাছে কোনও হুমকি নয়। আমরা (ভারত) তাদের দুই দেশের মধ্যকার সামরিক অংশীদারিত্বে আপত্তিও করতে পারি না, কারণ তারা সার্বভৌম রাষ্ট্র। তবে এতে চীনের একটি নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকা উচিত। বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার অতীত সম্পর্ক যে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না সেকথা উল্লেখ করে অধ্যাপক বলেন, চীন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। বাঙ্গালিদের হত্যায় পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়েছিল, নৈতিক সাহস জুগিয়েছিল। এমনকী সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জাতিসঙ্ঘে অন্তর্ভুক্তি ঠেকাতে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে তারা তাদের প্রথম ভেটো শক্তি প্রয়োগ করেছিল।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত থাকা পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি চীন। চীনের স্বীকৃতি আসে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হওয়ার পর। এরপর থেকে একে অন্যের কাছাকাছি আসতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সময় এই সম্পর্ক গভীরতা পায় এবং চীনের সামরিক সহযোগিতা দ্রুত বাড়ে।

সেই সম্পর্কের ধারবাহিকতায় ২০১৬ সালে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ-এ যোগ দেয় বাংলাদেশ। রিপোর্ট বলছে, কিছু বিশ্লেষক বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতাকে শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপ-সহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে দুর্বল করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দেখেন। এ প্রসঙ্গে কাজাকিস্তান, সুইডেন ও লাটভিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনকারী কূটনীতিক অশোক সাজ্জানহার বলেন, এ কারণেই তারা (বেইজিং) নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল এবং ২০২১ সালে বাংলাদেশকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন কোয়াডে যোগদান থেকে বিরত থাকতে (আগাম) হুমকি দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান চতুর্দেশীয় ওই ব্লক বা কোয়াডের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ বা কোয়াডের কোনো সদস্য--- কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে (অন-রেকর্ড) স্বীকার করেনি যে, তারা ঢাকাকে কোয়াডের নতুন সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

ওই কূটনীতিক বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতির পালটা ব্যবস্থা হিসেবে নয়াদিল্লি যথাযথভাবে ঢাকায় তার নিজের অবস্থান জোরদার করছে। তার মতে, বাংলাদেশকে প্রতিরক্ষা সামগ্রী আমদানির জন্য ভারত ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা দিয়েছে। সেই ঋণের অর্থে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ১৮টি ১২০ মি.মি. মর্টার পায়, যা ছিল ঢাকা-দিল্লির প্রতিরক্ষা খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার অংশ।

বিশেষজ্ঞদের সতর্কতা : দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরে চীনের ক্রমবর্ধমন প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তাদের (চীন) চেকবুক ডিপ্লোমেসি এবং অস্ত্র সরবরাহকারী হিসেবে ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিপরীতে ভারতকে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে পথ চলতে হবে। এ বিষয়ে দিল্লির প্রাক্তন বিদেশ সচিব কানওয়াল সিবাল বলেন, চীনের আগ্রাসন এবং ভূ-রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা দক্ষিণ এশিয়াকে শক্তি প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে পরিণত করেছে। এ অবস্থায় চীনকে ভারতের কৌশলগত আঙিনা থেকে দূরে রাখতে ভারতকে অবশ্যই ত্রিমুখী কৌশলে লড়তে হবে। কৌশল ৩টি হচ্ছে— (১) উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য অভ্যন্তরীণ নীতিগুলোকে সমুন্নত রাখা। (২) সব প্রতিবেশীর সঙ্গে সক্রিয়তা এবং সদ্ভাব বজায় রেখে চলা এবং (৩) প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা।

তবে এ বিষয়ে নয়াদিল্লির জওহরলাল ইউনিভার্সিটির চায়নিজ স্টাডিজের অধ্যাপক ড. শ্রীকান্ত কোন্দাপল্লির মত হচ্ছে--- বেইজিঙের বিরুদ্ধে অবশ্যই পালটা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে দিল্লিকে। অন্যান্য এশীয় দেশগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। তিনি বলেন, আমরা ভারতের উদ্ভাবন করা ক্ষেপণাস্ত্র যেভাবে ফিলিপাইনে পাঠাচ্ছি; একইভাবে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনামের মতো অন্যান্য চীন-বিরোধী দেশগুলোতে তা পাঠাতে পারি।

এছাড়া ঢাকার সঙ্গে আমরা এমন এক সমীকরণ পুনঃস্থাপন করতে পারি, যাতে চীনের নাম উল্লেখ না করে এ সংক্রান্ত যৌথ বিবৃতি দেওয়া হবে; যেখানে জোর দিতে বলা হবে দিল্লি বা ঢাকা কেউই এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে এমন কোনো কিছু থেকে বিরত থাকতে হবে।

ছয় লক্ষ গ্রাম এবং একশোটি শহরের থ্রিডি ম্যাপিং শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভবিষ্যতের পথ হলো প্রযুক্তি। এবং সেই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন ভারতের কাঠামো নির্মিত হচ্ছে। এখন প্রযুক্তির ব্যবহার নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল বা মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এখন তা দেশের দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য ব্যবহার

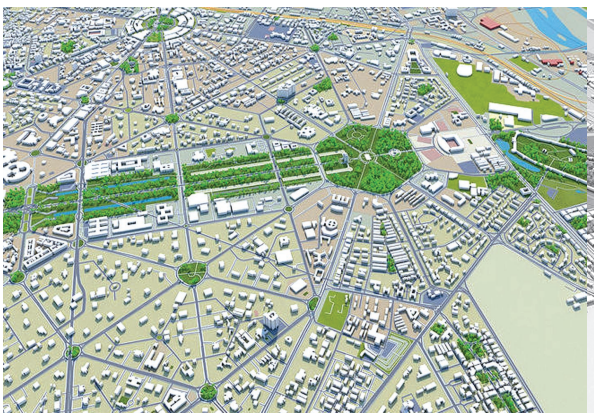

করা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে প্রধানমন্ত্রীর মালিকানা প্রকল্প। এটি এমন একটি প্রকল্প যা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা সম্পত্তি বিবাদের অবসান ঘটিয়ে মালিককে তাঁর প্রাপ্য অর্থ বা জমি প্রদান করছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২০ সালের অক্টোবরে স্বামীত্ব প্রকল্প চালু করেছিলেন। এই প্রকল্পের অধীনে ড্রোন ব্যবহার করে দেশের ছয় লক্ষ গ্রাম এবং একশোটি শহরে থ্রিডি ম্যাপিং সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পে ভূ-স্থানিক ব্যবস্থা, নতুন ড্রোন নীতি যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি হবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো আকাশ থেকে করা সমীক্ষা, যেখানে ড্রোনগুলি থ্রিডি ম্যাপিং ব্যবহার করে ৮৩ কোটিরও বেশি ভারতীয়দের আবাসিক সম্পত্তিকে বৈধ করার জন্য ম্যাপ করবে। একবার জরিপ সম্পন্ন হলে, দেশের জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশের পক্ষে তাঁদের গ্রামীণ আবাসিক সম্পত্তিকে আর্থিক সম্পদ হিসাবে বৈধ এবং ব্যবহার করা সহজ হবে।

সরকার নব ভারত সাক্ষরতা কর্মসূচি অনুমোদন করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সি দেশ ভারতে সবচেয়ে বেশি কর্মক্ষম জনসংখ্যা থাকবে। সেই দিক থেকে বিচার করলে দেশের ১০০ শতাংশ সাক্ষরতা অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৩৩ বছর পর একটি নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির কাঠামো প্রস্তুত করেছে এবং বয়স্ক শিক্ষা নামে এই প্রকল্পটিকে প্রসারিত করেছে। এর অধীনে ১৫ বছরের বেশি বয়সি সকলেই এখন শিক্ষিত হবেন। 'বয়স্ক শিক্ষা' এই শব্দবন্ধ 'সকলের জন্য শিক্ষা'য় পরিবর্তিত হবে। এই উদ্যোগের নাম হবে 'নব ভারত সাক্ষরতা কর্মসূচি'। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ এবং ২০২১-২২ সালের বাজেট ঘোষণায় বয়স্ক শিক্ষার সমস্ত দিক সংযুক্ত করে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি ২০২২ থেকে ২০২৭ পর্যন্ত চলবে, এর জন্য প্রায় ১০৩৮ কোটি টাক খরচ হবে। এই কর্মসূচিতে ডিজিটাল ও অনলাইন মাধ্যমে শিক্ষাকেও কাজে লাগানো হবে।

এই স্কিমের লক্ষ্য হলো পাঁচ বছরের মধ্যে পাঁচ কোটি শিক্ষার্থীকে মৌলিক শিক্ষা এবং অর্থপূর্ণ জ্ঞান প্রদান করা। নতুন বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমে মৌলিক সংখ্যা, সাক্ষরতা এবং গুরুত্বপূর্ণ জীবন দক্ষতা সম্পর্কিত জ্ঞানের মতো পাঁচটি প্রধান বিষয় রয়েছে। এতে মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অলিম্পিক কমিটির অধিবেশনের আয়োজন করবে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আগামী বছর ভারত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অধিবেশন আয়োজন করবে। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হবে কারণ ১৯৮৩ সালের পর নয়াদিল্লিতে ভারত কোনো আইওসি'র অধিবেশনের আয়োজন করেনি। আইওসি সদস্যরা অলিম্পিক চার্টার এবং অলিম্পিক আয়োজনকারী শহর নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে। বার্ষিক সভার আয়োজক ভোটে ভারত ৭৬ বৈধ ভোটের মধ্যে ৭৫টি পেয়েছে। এই বৈঠকটি মুম্বাইয়ে

অনুষ্ঠিত হবে। আইওসির বার্ষিক সভায় সকল সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এটি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সবচেয়ে বড়ো সভা যেখানে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী অধিবেশনের বৈঠকের আয়োজনে আনন্দিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় টুইট করেছে, '২০২৩ সালের আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অধিবেশনের জন্য আয়োজক দেশ হিসেবে ভারতকে নির্বাচিত করা হয়েছে। খুবই আনন্দের খবর। আমি নিশ্চিত যে আইওসি'র এই অধিবেশন সফল হবে এবং ক্রীড়া জগতের জন্য ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাবে।'

সুন্দরবনের ‘বাঘ বিধবা’দের জন্য নতুন জীবন দিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন বাঘের জন্য সারা বিশ্বে বিখ্যাত। ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এই অঞ্চলে রয়েছে বহু নদী, খাঁড়ি এবং ঘন ম্যানগ্রোভ বনভূমি। এখানে ১০০ জনেরও বেশি ‘বাঘ বিধবা’ রয়েছেন। এই অঞ্চলের বেশিরভাগ পুরুষ ঘন জঙ্গলে মাছ ধরতে যায়, অনেক সময় তাঁরা বাঘের অক্রমণে নিহত হন। তাঁদের স্ত্রীদের ‘বাঘ বিধবা’ বলা হয়। বাঘের আক্রমণে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর মৃত্যুর পর অধিকাংশ পরিবার দিশেহারা হয়ে পড়ত। এমতাবস্থায়, স্বাধীনতার পর পরই উন্নয়নের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপটি এখন খাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। ২০১৮ সালে এই মহিলারা খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প কমিশনের (কেভিআইসি) সুতা কাটার কাজে জড়িত ছিল। এখানে একটি অস্থায়ী ভবনে ‘টাইগার ভিকটিম খাদি স্পিনিং সেন্টার’ চালু হয়। মহিলাদের মধ্যে চরকা বিতরণ করা হয়েছিল। চরকা কেন্দ্রের অস্থায়ী অংশটি এখন একটি বড়ো জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে, ৩০০০ বর্গফুটের এই কাজের জায়গায় একটি ৫০০ বর্গফুট সাধারণ সুবিধা কেন্দ্রও রয়েছে। এখানে আধুনিক তাঁত এবং চরকাও রয়েছে। বাঘের আক্রমণে যাঁদের পরিবারে দুর্যোগ নেমে এসেছিল তাঁরা এখন এই কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে পেরেছেন, নতুন পথে শুরু হয়েছে জীবন। এটি তাঁদের কাছে কেবলমাত্র আয়ের একটি উৎসই নয়, বরং এটি তাঁদের নতুন করে জীবন শুরু করতে উৎসাহিত করেছে।

নেপালে ভারতের ইউপিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সারা বিশ্ব এখন ভারতের ডিজিটাল পদ্ধতির কার্যকারিতা স্বীকার করেছে। কোভিড সময়কালে টিকা দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল কোউইন অ্যাপটি, সারা বিশ্ব তার প্রশংসা করেছে। এখন নেপাল ডিজিটাল লেনদেনের জন্য ভারতের ইউপিআই (ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস) গ্রহণ করেছে। এটি তাৎক্ষণিক সময়ে এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তি (পি২পি) এবং ক্রেতা থেকে বিক্রেতা (পি২এম) লেনদেন ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করবে। এর ফলে নেপালের মানুষ সহজে ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধা পাবেন। এই বছরের প্রথমদিকে ভুটানও একটি ভিম ইউপিআই ভিত্তিক পরিষেবা চালু করেছে। ২০১৬ সালে ভারতে প্রথম ইউপিআই চালু হয়েছিল। ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় এটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল, এর ফলে দেশে ডিজিটাল অর্থনীতি মজবুত হয়েছে। ফলস্বরূপ, ভারতে ডিজিটাল লেনদেন ১৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র ভারতেই গত অর্থবর্ষে মোট ৩৯০০ কোটি বার লেনদেন করা হয়েছিল, লেনদেনের অঙ্ক ছিল ৯৪০ বিলিয়ন ডলার। এটি ভারতের মোট জিডিপির ৩১ শতাংশের সমান।

With Best compliments from -

A Well Wisher

ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড মাত্রাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পশ্চিমবঙ্গে ১৭ জেলায় ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইডের পরিমাণ মাত্রাছাড়া। গত ২৪ মার্চ লোকসভায় এই তথ্য দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি সমীক্ষা চালিয়ে সারা দেশের ২১টি রাজ্যের এমন ১৫২টি জেলা চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে জলে আর্সেনিকের পরিমাণ লাগামছাড়া। একইভাবে দেশের ২৩টি রাজ্যের ৩৭০টি জেলার অংশ বিশেষেও জলে ফ্লোরাইডের পরিমাণ সহনীয় মাত্রা থেকে অনেকটাই বেশি। জলশক্তি মন্ত্রকের এই রিপোর্টকে যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলে মনে করা হচ্ছে। বিভিন্ন সমীক্ষার মাধ্যমে সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড সারা দেশে ভূগর্ভস্থ জলের গুণগত মান সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করে। ভূগর্ভস্থ প্রতি লিটার জলে আর্সেনিকের মাত্রা যদি ৩.০১ মিলিগ্রামের বেশি থাকে, তাহলে ওই জলকে দূষিত বলে ধরে নেওয়া হয়। এই মাপকাঠি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের মোট ৯টি জেলার বিভিন্ন অংশের ভূগর্ভস্থ জল আর্সেনিক- দূষিত। সেগুলি হলো, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং কোচবিহার।

অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ জলে ফ্লোরাইডের মান প্রতি ১ লিটারে দেড় মিলিগ্রামের বেশি থাকলেই তা দূষিত হিসেবে গণ্য হয়। পশ্চিমবঙ্গে এমন জেলার সংখ্যা আটটি। বাঁকুড়া, বীরভূম, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়া। কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রক এদিন সংসদে লিখিত ভাবে জানিয়েছে, ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ রোধ করার জন্য ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

রপ্তানিতে ভারত সাফল্যের চূড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'ভোকাল ফর লোকাল'— এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ভারতবাসী বর্তমানে ভারতীয় পণ্যের প্রতি অনেক বেশি যত্নবান হয়েছেন। সেই সুবাদে স্থানীয় পণ্যের চাহিদা বিশ্বব্যাপী দিনদিন বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার দেশীয় পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ইতিমধ্যেই তা পূরণ হয়েছে। ২৭ মার্চ রবিবার 'মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'বর্তমানে গোটা বিশ্বে ভারতের পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। ভারত বিভিন্ন দেশের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পেরেছে। এটিকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সাফল্য হিসেবে দেখলে চলবে না। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা আজ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা বোঝা যাচ্ছে। একটা সময় ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল বছরে ১০০-১৫০ বিলিয়ন ডলার।

কিন্তু আজ সেটা ৪০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গিয়েছে। দেশের কৃষক, শিল্পপতি-সহ অন্যান্য পণ্য উৎপাদকদের যোগ্যতা 'মেক-ইন-ইন্ডিয়া' পণ্যের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'ডেনমার্ক, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশেও এখন ভারতের পণ্য যাচ্ছে। এখন আপনি বিদেশে গেলে অনেক বেশি মেড-ইন-ইন্ডিয়া পণ্য দেখতে পাবেন।' সর্বোপরি রপ্তানিতে ভারতের লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়ে ফেলায় প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ২৭।।

গুরুজীর জন্য অনেক কিছু ভেবে রেখেছিলেন ডাক্তারজী। সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ নিয়ে সেইসব পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার আগে তিনি ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মতামত নিলেন।

আপ্পাজী সেদিনের ঘটনা ভুলতে পারেননি।

কী আত্ম সংযম! যেন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি, মুহূর্তের মধ্যে বরফের চূড়ার মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেল, একজন প্রকৃত যোগী।

আজকের উত্তপ্ত আলোচনা কেমন লাগলো? আর হ্যাঁ, আপনার প্রতিপক্ষকে কেমন লাগলো?

দারুণ! মানুষটার মধ্যে এত আত্মসংযম আছে, তা জানতাম না।

ডাক্তারজী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বললেন...

আমার পদে বসার জন্য ও যোগ্য ব্যক্তি।

হ্যাঁ, সঙ্ঘকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক নির্বাচন।

আপ্পাজীর উত্তর শুনে ডাক্তারজীর চিন্তা দূর হলো।

গুরুজীকে কলকাতায় সঙ্ঘের শাখা তৈরির দায়িত্ব দিলেন ডাক্তারজী। গুরুজী কলকাতায় পৌঁছে তরুণদের সঙ্গে দেখা করলেন।

হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করাই আমাদের প্রথম কাজ।

চলবে